ভাটিয়ালী

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

কথামালা প্রকাশনী
৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

সন্তোষকুমার দে

বন্ধুবরেষু

অনেক বেশি আকাশ

"এ পর্যন্ত প্রায় একশো বাইশ টাকার মতো আমার খরচ হয়েছে হিসেব করে দেখেছি। খুচরোগুলো বাদ দিলেও একশো টাকার মতো দাঁড়ায়। এখন আমার ভয়ঙ্কর টাকার দরকার। আশা করি, অন্তত গোটা পঞ্চাশেক টাকা তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে পাঠিয়ে দেবে।"

শখ করে কেনা ফিকে নীল কাগজের প্যাডটার চার চারটে পাতা নষ্ট হল কথা কটা লিখতে। তারপর যখন লেখা শেষ হল, তখনো অনেকক্ষণ ধরে কুমারকান্তি জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইল। রাস্তায় ট্রামের তারে ঝুলতে থাকা একটা কালো ঘুড়ির ধ্বংসাবশেষকে ক্রমাগত তার একটা মরা বাদুড় বলে মনে হতে লাগল।

আরো খানিক পরে নীচের চৌবাচ্চায় জল পড়ার একটানা আওয়াজটা যখন ভারী বিশ্রীভাবে তার কানে আঘাত করতে লাগল, তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কুমারকান্তি। রবারের স্লিপারে পা গলিয়ে একেবারে নেমে পড়ল রাস্তায়।

বাঁ হাতে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে সেই হলদে রঙের দেওয়ালটা। কতদিন ধরে যে একভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কে জানে! সারা গা পোস্টারে পোস্টারে ছাওয়া—তাদের নিচে আরো লক্ষ লক্ষ পোস্টারের আণবিক স্মৃতিচিহ্ন। শ্মশানঘাটের ঘরের দেওয়ালের মতো। কাঠ-কয়লার লেখার বদলে রঙিন কালির স্বাক্ষর।

পোস্টারের পর পোস্টার বদলেছে, কিন্তু দেওয়ালটা বদলায় নি। আর বদলায় নি ভূতুড়ে হাতের মতো নিমগাছের সেই আঁকা-বাঁকা ডালটা—যেটা প্রাচীরের ওপার থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তার দিকে কিছু একটা ধরতে গিয়েই কুঁকড়ে থমকে গেছে। আরো বদলায় নি মোষের ঘন রক্তের মতো লাল ওই চিঠির বাক্সটা। দেওয়ালটাকে আঁকড়ে ধরে বছরের পর বছর, রোদ-বৃষ্টি দাঙ্গা-যুদ্ধ-মন্বন্তর সব কিছু পেরিয়ে অক্ষয় হয়ে ওখানে অপেক্ষা করে আছে। কুমারকান্তির মনে হয়, যদি কোনো প্রচণ্ড একটা ভূমিকম্পে সারা কলকাতা বালির বুরুজের মতো এলিয়ে পড়ে, সেদিনও ওই দেওয়ালটা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে ; আর দাঁড়িয়ে থাকবে ওই লেটার বক্সটা, অফুরন্ত রৌদ্র-জ্যোৎস্না-বর্ষা-তমিস্রাকে পান করতে থাকবে একভাবে।

কুমারকান্তি চিঠির বাক্সটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ক্লিয়ারেন্সের সাদা লেখাটাকে পড়ল তিন-চারবার। পুরনো ছোট্ট পেতলের তালাটার সবুজ কলঙ্কের দিকে চেয়ে রইল বিস্বাদ দৃষ্টিতে। মাথার উপর নিমগাছের ভূতুড়ে বাঁকা ডালটায় চাপা খসখস খরখর আওয়াজ উঠতে চমকে উঠল দু-তিনবার। কয়েকজন চিঠি ফেলতে এলে সরে সরে দাঁড়াতে লাগল। কিন্তু হাতের চিঠিখানা কিছুতেই সে বাক্সটার হাঁয়ের মধ্যে ছেড়ে দিতে পারল না।

ট্রাম আর বাসের চাকায় সময় চলতে লাগল। নিমের ডালটায় গোটা চারেক কাক আনাগোনা করে গেল। মামলার খবর আর প্রেমপত্র, কুশল-প্রশ্ন আর মৃত্যু-সংবাদ ঠাসাঠাসি করে ভিড় জমাতে লাগল বাক্সের ভিতর। তবু কুমারকান্তি চিঠিটা বাক্সে ফেলতে পারল না। শেষ পর্যন্ত দেওয়ালের গায়ে একজন জর্দাবিলাসিনী নারীর পোস্টারের উপর সে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, চিঠিটা ভিজে উঠতে লাগল হাতের ঘামে।

আজ কিসের একটা পর্ব-দিন, অফিস ছুটি। তাই চিঠিখানা ডাকে ফেলতে যতক্ষণ ইচ্ছে দেরি করতে পারে কুমারকান্তি। একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে যতক্ষণ খুশি।

অনেকক্ষণ সময় হাতে আছে কুমারকান্তির। উত্তরপাড়ার সেই মেয়েটির কথা গোড়া থেকে ভেবে নেবার মতো অনেক— অনেক সময়—

মুখ চেনা হয়েছিল কোন্ এক বিয়েবাড়িতে। পরিবেশনের ভার ছিল কুমারকান্তির আর মেয়েটি ছিল ভাঁড়ারের চার্জে। বালতি আর গামলা নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটোছুটি করতে করতে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখবারও সময় ছিল না কুমারকান্তির। দই দরবেশ সন্দেশ কালোজামের ভিড়ে এই মেয়েটির প্রায় অস্তিত্বই কোথাও ছিল না।

দেখা হয়ে গেল ট্রামে।

পিণ্ড পাকানো ভিড়। সোয়া দশটার দম আটকানো আনন্দঘন অবস্থা। কপাল দিয়ে দরদর করে ঘাম পড়ছে, কিন্তু পকেট থেকে রুমালটা পর্যন্ত টেনে বার করা অসম্ভব। সেই সময় যেন আকাশবাণী শোনা গেল। পরিষ্কার মিষ্টি গলাঃ বসুন না এখানে—জায়গা তো রয়েছে।

স্বয়ম্বর-সভায় কম্পিতবক্ষ ক্ষত্রিয় রাজাদের মতো বারো-তেরো জোড়া চোখ এক সঙ্গে ঘুরে গেল শব্দটার দিকে। কে এই ভাগ্যবান!

মেয়েটি অবস্থাটা অনুমান করল। তারপর সোজা কুমারকান্তির দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে বললে, চিনতে পারছেন না? আসুন, বসে পড়ুন।

আর অপেক্ষা করল না কুমারকান্তি। সে যদি চিনতে দেরি করে, আর কারো চট করে চিনে ফেলা আশ্চর্য নয়। কনুয়ের গুঁতোয় পাশের আধবয়েসী ভদ্রলোককে কণ্ডাক্টারের ঘাড়ের উপর ঠেলে দিয়ে ঝুপ করে মেয়েটির পাশে বসে পড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাসের মতো বয়ে গেল চারদিকে।

মেয়েটি আবার বললে, বাঃ, ভুলে গেলেন এর মধ্যেই? আমি কনক—কনকলতা।

ভারি পুরনো নাম কনকলতা। ও নামের যারা ছিল, তারা চল্লিশ বছর বয়েস পেরিয়ে গেছে আজকাল। গরদের চওড়া লালপাড় শাড়ি পরা, কপালে মোটা সিঁদুরের টিপ, হাতে গঙ্গাজলের ঘটি—এমনি যে-কোনো একজন মহিলার নামই কনকলতা হওয়া স্বাভাবিক। চিবুকের নিচে ছোট্ট ভাঁজপড়া ছিপছিপে এই শ্যামশ্রী মেয়েটির ওই নামটা রসাভাসের মতো মনে হল কুমারকান্তির।

কিন্তু কোথায় দেখেছিল ওকে? কবে পরিচয় হয়েছিল?

তারপর দই দরবেশ আর একরাশ বিশৃঙ্খল কোলাহলের ঘূর্ণি সরে গেলে মনে পড়ল। সরু মাজাটিতে নীল শাড়ির আঁচল শক্ত করে জড়ানো। কপালে গোটা কয়েক ঝুরো চুল। তুগাছি তারের বালা তু হাতে। মুখের ধরনটা অত শান্ত আর বিষণ্ণ না হলে কিশোরী বলে চালিয়ে দেওয়া যেত।

চকিত হয়ে কুমারকান্তি বললে, রানুর বিয়েতে—তাই নয়?

কনকলতা হাসল: মনে পড়ল এতক্ষণে? আমি কিন্তু ভুলি নি। যা তাড়াহুড়ো দিয়েছিলেন—উঃ!

এবার অপ্রতিভ হাসি হাসল কুমারকান্তিও। আবছা আবছা স্মৃতি আসছে। শুধু তাড়াহুড়োই নয়—একবার ধমক দিয়ে

বলেছিল, দেখুন, অত ঢিমে তেতালায় কাজ করলে চলবে না। এর পরে পাতা ছেড়ে উঠে যাবে লোকে।

তারপর দুজনেই চুপচাপ। ট্রামে পিণ্ডাকার জনতা। ঘণ্টার শব্দ। কথা আর তর্কের কলরোল। নলবন ভেঙে মদমত্ত হাতির মতো এক-আধজনের অবতরণ।

কনকলতার বিষণ্ণ শান্ত মুখের কোমল রেখাগুলো দেখতে দেখতে কুমারকান্তি বললে, অপরাধের কথাটা মনে আছে দেখছি!

—বাঃ, অপরাধ কেন হবে? বিয়েবাড়ির ডামাডোলে ওরকম তো সব সময়েই হয়।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। ওটুকু ছাড়া কনকলতার আর কোনো পরিচয় জানা নেই কুমারকান্তির। কনকলতা শুধু জানে গেঞ্জি গায়ে তোয়ালে কাঁধে তার সেই মূর্তিটার কথা। একমাত্র আলাপ চালানো যায় সেই বিয়েবাড়িকে কেন্দ্র করেই। তাও কে তিরিশটা রসগোল্লা খেয়েছিল আর এক ভাঁড় দই নিয়ে কে হুড়মুড় করে পড়ে গিয়েছিল, তারপরে আলোচনা আর এগোবে না।

অনেক দেরিতে, প্রায় অবান্তরভাবেই কুমারকান্তি জিজ্ঞাসা করল: ভালো আছেন?

—আছি। আপনি?

—আছি একরকম।—যেমন বলতে হয়। কৌতূহলহীন সৌজন্য।

শেষ কথা হল গাড়ি যখন ডালহৌসি স্কোয়ারে বাঁক ঘুরছে, তখন। পরের স্টপটায় নেমে পড়বার জন্যে কুমারকান্তি যখন তৈরি হচ্ছে—সেই সময়।

—আফিসে যাচ্ছেন বুঝি?—কনকলতা জানতে চাইল।

কোল থেকে ফোলিও ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে কুমারকান্তি

বললে, কী আর করা! কিন্তু আপনি? এই ভিড়ের মধ্যে কোথায় চললেন?

—আমারও একই দশা। চাকরি।

—চাকরি?—কুমারকান্তি ভুরু কোঁচকাল একবার। আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, আরো অনেক মেয়েকেই চাকরি করতে হয়। কিন্তু সে-জন্যে চোয়াল দুটো আরো একটু উঁচু হলে ভালো হত কনকলতার, আরো কয়েকটা রেখা পড়া উচিত ছিল কপালে, একটা কালো ফ্রেমের চশমা থাকলে তাকে আরো বেশী মানাত।

নামবার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে কুমারকান্তি বললে, কোন্ অফিসে?

একটা বিলাতী ফার্মের নাম করলে কনকলতা। কুমারকান্তির অফিস থেকে খান সাতেক বাড়ির পরেই। অর্থাৎ আরো একটা স্টপের ব্যবধান।

তারপর। তারপর ওই ব্যবধানটুকু পার হতে কতক্ষণ সময় লাগে আর? একবার চিবুকের নিচে ভাঁজপড়া শান্ত বিষণ্ণ মুখখানা চেনা হয়ে থাকলে সহস্রের মধ্যেও কি আর অসুবিধে হয় চিনে নিতে? অফিস থেকে বেরিয়ে চা খাওয়া যায় একসঙ্গে; খুব বেশী ভিড় দেখলে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা রাস্তা পাড়ি দেওয়া যায়; সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে কনকলতাকে তুলে দিয়ে আসতে মধ্যে মধ্যে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত যেতে পারে বইকি কুমারকান্তি।

শেষ পর্যন্ত বোস বললে, দাদা, ব্যাপার কী?

ঘোষ একটিপ নস্যি নিয়ে তার গুঁড়োগুলো হাওয়ায় ছড়িয়ে দিলে: হুঁ, বড্ড ঘন ঘন চোখে পড়ছে!

বাঁড়ুজ্যে ব্লটিং প্যাডে কলমটা মুছতে মুছতে বললে, এ সমস্ত কী শুনছি হে? এ তো ভালো নয়।

মুখুজ্যে চশমাটা কপালে ঠেলে দিয়ে কটকটে গম্ভীর চোখে তাকাল। পান-চিবুনো ভরাট মুখে বললে, ছি ছি কুমারকান্তি,

তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। বিয়ে করেছ, ছেলেপুলে রয়েছে। দেশে তোমার স্ত্রী যদি এসব জানতে পারেন—

শেষ কথাটার নগ্ন রূঢ়তা বন্দুকের গুলির মতো এসে লাগল। এতক্ষণ সবাই যে কৌতুক আর কটাক্ষের আবরণ টেনে রেখেছিলেন, তাতে লজ্জাবোধ হচ্ছিল না কুমারকান্তির। নেশার একটা হালকা আমেজের মতো নিঃশব্দে সেগুলোকে উপভোগ করছিল সে। কিন্তু মুখুজ্যের কথায় চেয়ারের উপর আচমকা নড়ে উঠল কুমারকান্তি, কালির শিশিটা উলটে গেল হাতের ধাক্কায়।

'যুদ্ধং দেহি' কঠিন মুখে কুমারকান্তি বললে, সে-সব ভাবনা আমিই ভাবব—আপনারা নয়। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা না করলেও আপনাদের ক্ষতি নেই।

মেঘ-থমথম বিকেল। চারদিকে আসন্ন-বৈশাখীর রুদ্ধশ্বাস। ছাতা নেই--ওয়াটার-প্রুফ্‌ও না। তবু তাড়াহুড়ো করে ট্রামেবাসে উঠে পড়ল না কুমারকান্তি। সম্পূর্ণ উল্টো দিকে হাঁটতে সে ওয়াটালু স্ট্রীট ধরল। ধুলো-ঝড়ের কয়েকটা ঝাপটা পেরিয়ে যখন সে ছোট একটা চায়ের দোকানে উঠে পড়ল, তখন বাইরে খরধারায় বৃষ্টি নেমে এসেছে।

পাঞ্জাবীর চায়ের দোকান—প্রায় ফাঁকা। কাচের গ্লাশভর্তি পাঞ্জাবী চা নিয়ে সে ঝিম্ ধরে বসে রইল। বাইরে ভিজে মাটি আর ভিতরে শিককাবারের একটা উগ্র উত্তেজক গন্ধের মধ্যে নিজের ভিতরে ডুবে রইল সে। ছাইদানের উপর নিবে-যাওয়া সিগারেটের মুখটা শক্ত আর কালো হয়ে গেল।

বিয়ে করেছে—ছেলেপুলে আছে। এ-সব কথা কুমারকান্তির চেয়ে কে আর ভালো করে জানে! তবু কী বিশ্রীভাবে মনে করিয়ে দিল সব। ধুলোর ঝড়ের ঝাপটা নয়—যেন রাস্তা থেকে

ম্যান্‌হোলের এক মুঠো বিষাক্ত কালো কাদা কেউ তার মুখের উপরে ছুড়ে দিয়েছে।

কত ছোট—কী দুঃসহ নাগপাশে জড়ানো এই জীবন! নিজেরই রক্ত-নির্যাসের মতো অফিসের মাইনে। মেসের অমৃত। স্ত্রীর চিঠি এলেই আতঙ্ক। ঠাণ্ডা চায়ের সঙ্গে বাসী জিলিপির মতো এক আধ বাজি তাসখেলার জোর করা আনন্দ।

এর মাঝখানে কোথা থেকে ছিটকে এসে পড়েছে উত্তরপাড়ার সেই মেয়েটি। কনকলতা। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে অজস্র সবুজ পাতার শিরশিরানি। পথের পাশ দিয়েই গঙ্গার উদার উজ্জ্বলতা। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকবার মতো প্রকাণ্ড চওড়া পুরনো আমলের ঘাট, অনেকখানি ঠাণ্ডা জল, অনেক হাওয়া আর অনেকটা আকাশ।

পুরনো চুন-বালির গন্ধে ভরা দেশের সেই পোড়ো বাড়ির ভদ্রাসন আর জংলা আমের বাগান নয়: অফিস-মেস-তাসের এঁদো অপরিচ্ছন্নতাও নয়। কনকলতা যেখান থেকে এসেছে, সেখানে সব-কিছুর আরো একটা মানে আছে। কেরোসিনের লাল্‌চে আলোয় আর মশার গুনগুনানির ভিতরেও যে-'আরো' নিদ্রাহীন রাতকে চঞ্চল করে রাখে—পাশের হাড়-মুড়্‌মুড়ি তক্তপোশে ডোরাকাটা লুঙ্গি পরা আর কপালে আঁবওলা সঙ্গীর নাকের ডাকেও যে-'আরো'র স্বপ্নে সুর কাটিতে চায় না!

গেলাসে পাঞ্জাবী চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। শিক-কাবারের উগ্র গন্ধে কী একটা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে ক্ষুধার্ত খালিপেটের ভিতরে। বাইরে একটানা বিবর্ণ বৃষ্টি। অনাবশ্যক দ্রুতগতিতে জল ছিটিয়ে গোটা কয়েক মোটরের আসা-যাওয়া।

কী ছোট—কত সংকীর্ণ এই জীবন! আর একবার কুমারকান্তি ভাবল্। যতই অঝোরে বৃষ্টি পড়ুক, এই পথটার উপরে কখনো

গঙ্গার ঢেউ খেলবে না ; যতই ঝোড়ো হাওয়ার ঝলক বয়ে যাক— রাস্তার ওপারের মাজাভাঙা গাছটায় কখনো সবুজের মাতামাতি শুরু হবে না। উত্তরপাড়ার সেই মেয়েটি কোনোদিন ধরা দেবে না কলকাতার মুঠোর মধ্যে।

শিক-কাবাবের গন্ধটা পেটের ভিতরে মোচড় দিচ্ছে। কিন্তু থাক। এ মাসে কনকলতাকে পঁচিশটা টাকা দিয়েছে সে। কিছুদিন আত্মনিগ্রহ ছাড়া উপায় নেই এখন। টাকাটা কনকলতা ঠিক চায় নি। শুধু কথায় কথায় বলেছিল, ছোট ভাইটার একরাশ স্কুলের মাইনে বাকী পড়ে গেছে, বাড়িতে মায়ের অসুখ—

মাইনের একটা অংশ পকেটেই ছিল। তা থেকে প্রায় জোর করেই পঁচিশ টাকা সে গুঁজে দিয়েছে কনকলতার হাতে। বলেছে, আপাতত এইটে দিয়েই কাজ চালিয়ে নিন।

—না না, সে কি হয়!—কনকলতা আপত্তি জানিয়েছেঃ আপনার হয়তো কত অসুবিধে হবে—

প্রায় বীরের মতো উদ্দীপ্ত গলায় কুমারকান্তি বলেছে, কিছু না, কিছু না—কোনো অসুবিধে নেই। ও-টাকাটা বাড়তিই ছিল।

—কী বলে যে ধন্যবাদ দেব আপনাকে!—চোখের কোণা চিকচিক করে উঠছে কনকলতারঃ আমি আসছে মাসের মাইনেটা পেলেই—

—দরকার নেই, কোনো তাড়াহুড়ো করতে হবে না। পরে সময়মত দিলেই চলবে।

এক চুমুকে বাকী ঠাণ্ডা চা-টা শেষ করে কুমারকান্তি পথের দিকে তাকিয়ে রইল। বৃষ্টিটা থেমে আসছে, রাস্তায় পঙ্কিল জল দু-পাশের ঝাঁঝরি দিয়ে ঝরে পড়ছে।

জল পড়ার ওই আওয়াজটা কুমারকান্তি সইতে পারে না— কেমন যেন একটা 'মেণ্টাল অ্যালার্জি' আছে তার। সঙ্গে সঙ্গেই

মুখুজ্যের পান-খাওয়া মুখের বিশ্রী কথাগুলো কানে আসছে : বিয়ে করেছ তুমি, ছেলেপুলে রয়েছে—

উঠে দাঁড়িয়ে এক ঝটকায় চেয়ারটাকে পিছনে সরিয়ে দিলে কুমারকান্তি। মালিকের টেবিলের উপরে ঠক করে একটা দু-আনি ছেড়ে দিয়ে পথে নেমে পড়ল, জলের মধ্যে জুতো ভিজিয়ে হেঁটে চলল ছপছপ করে।

বলুক। যার যা খুশি তাই সে বলুক।

দুদিন ধরে নিজের মনের মধ্যে অসহ্য টানা-পড়েন। যেন জ্বরের ঘোরে মুখটা তেতো-তেতো হয়ে থাকা। সকালে বিছানা ছাড়তে গিয়ে মাথার ভিতরে শ্রান্তির গুরুভার। যেন হাজার মাইল ট্রেন-জার্নির পরে হাড়ে হাড়ে একটা চাপা যন্ত্রণা।

তারপর মনে হল বলুক ওরা। যার যা খুশি তা-ই বলুক।

আরো যেন বেপরোয়া হয়ে উঠেছে কুমারকান্তি। কনকলতাকে হাওড়া পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া অভ্যাসের মধ্যেই দাঁড়িয়ে গেছে এখন। ট্রামের ভিড়ে বসবার জায়গা যদি না জোটে, অন্তত কনকলতার সীটের পিছনেও সে দাঁড়িয়ে থাকবে—অপেক্ষা করবে প্রহরীর মতো। হঠাৎ সে আবিষ্কার করেছে, এই কলকাতা শহরের বীভৎস লোলুপতা আছে একটা—এখানকার মানুষের ছাই-ছাই চোখের নিচে লক লক করছে আদিম আগুন। উত্তরপাড়ার ওই মেয়েটি—যার চিবুকের নিচে কোমল একটি ভাঁজ পড়েছে, মুখে শান্ত বিষণ্ণতার ছোঁয়া না লাগলে স্বচ্ছন্দে যাকে কিশোরী বলে চালিয়ে দেওয়া যেত—এই হিংস্র শহরে তাকে এমন করে ছেড়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। তার প্রতি একটা দায়িত্ব আছে কুমারকান্তির।

বিয়ে করেছে সে! বেশ করেছে। ছেলেপুলে রয়েছে! থাকুক। তার সঙ্গে কী সম্পর্ক এর? কনকলতাকে মাঝে মাঝে

এক-আধটু এগিয়ে দেওয়া, কখনো-কখনো এক-আধ টুকরো উপকার করা। কার কী আসে-যায় তাতে! তার স্ত্রীরও নয়—পৃথিবীরও না।

আজ আর স্টেশন পর্যন্ত নয়, একটা প্ল্যাটফর্ম টিকেট কিনে একেবারে গাড়ি পর্যন্ত।

কনকলতা বিব্রতভাবে বললে, কেন মিথ্যে কষ্ট করছেন? ফিরতে দেরি হয়ে যাবে আপনার।

—তা হোক। মেসে আমার জন্যে কেউ পথ চেয়ে বসে নেই।

আবার কী বলতে চাইছিল কনকলতা—ঢন্ ঢন্ করে ঘণ্টা পড়ল। মাথার উপরে মেয়েলী গলায় আকাশবাণী বেজে উঠল : ছ' নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ব্যাণ্ডেল লোক্যাল—

উত্তরপাড়ার এই গাড়িটা একদিনও লেট্ করে ছাড়ে না—আশ্চর্য!

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে দু প্যাকেট মিল্ক-চকোলেট বের করে কুমারকান্তি এগিয়ে দিলে কনকলতার দিকে : নিন, রাখুন।

—ছিঃ ছিঃ, কী অন্যায়!—সিঁদুরের ছিটে পড়ল কনকলতার মুখে : চকোলেট খেতে ভালবাসি বলেছিলুম, সেই জন্যে—

—ভাববেন না, কিনতে হয় নি।—অভ্যাস করতে করতে মিথ্যে কথাটা অনেকখানি আয়ত্ত হয়ে এসেছে কুমারকান্তির : আমার এক বন্ধু বিলিতী কোম্পানির টেস্টার—এ-সব অনেক সে ফ্রী পায়। সে-ই দিয়েছে।

হাতের মুঠোয় চকোলেটের মোড়ক দুটো নিয়ে বিপন্ন মুখে চেয়ে রইল কনকলতা। ফেরত দেবে কিনা ভাবতে ভাবতেই ট্রেন চলতে শুরু করে দিলে।

শিস দিতে দিতে মেসে ফিরল কুমারকান্তি। টেবিলে একখানা চিঠি। এ মাসে বাড়িতে পনেরো টাকা কম পাঠানো হয়েছে বলে অসন্তুষ্টির গুঞ্জন।

চিঠিটার শেষ পর্যন্ত সে পড়ল না। যেমন রাখে, তেমনি ঠেলে রাখল তোষকের তলায়।

রাত্রে শুয়ে শুয়ে তার মনে হতে লাগল, কেমন খচখচ করছে পিঠের নিচে—অসুবিধে হচ্ছে ঘুমুতে। পুরনো চিঠিগুলো আর জমিয়ে রেখে লাভ কী—একসঙ্গে জড়ো করে পুড়িয়ে দিলেই হয় সমস্ত।

ভাবতে ভাবতে একটা নিটোল ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল তার।

এক মাস—দু মাস—তিন মাস। চারদিকের মানুষের গা-সওয়া হয়ে গেছে এখন। শুধু থেকে থেকে মুখুজ্যের হঠাৎ যেন মনে পড়ে যায়। চশমাটাকে ঠেলে তোলে কপালে—কেমন কট্ কট্ করে তাকিয়ে থাকে খানিকক্ষণ। দেখেও দেখে না কুমারকান্তি। অবজ্ঞা করবার শক্তি এসে গেছে নিজের মধ্যে।

এত দিশী-বিলিতী কোম্পানিতে তার এত বন্ধু আছে, এত জিনিস তারা ফ্রী পায়—এর আগে কে জানত সে কথা! দু-এক বাক্স সাবান, ভালো সুগন্ধি তেল। শান্তিপুরের এক বন্ধু তো জোর করেই একখানা চমৎকার তাঁতের শাড়ি দিয়ে গেল তাকে। তা ছাড়া পনেরো-বিশটা বাড়তি টাকা প্রায়ই জমতে লাগল তার হাতে। এ-সব এমনিতে তো পড়েই থাকত—না হয় কনকলতারই কাজে লাগল।

কনকলতারও অভ্যাস হয়ে গেছে আস্তে আস্তে। গোড়ার দিকে খুব আপত্তি করত—এখন আর করে না। বরং আশাই করে হয়তো। অস্পষ্টভাবে ইঙ্গিতও করে আজকাল।

—তোমার সেই সাবানের কারখানার বন্ধুটি ইদানীং আসছেন না কুমারদা ?

—কালকেই হয়তো দেখা হবে আর একবার।—তৎক্ষণাৎ জবাব দেয় কুমারকান্তি, সাবান চাই নাকি ?

—না, না, এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

সাবান-কারখানার বন্ধুটি যেন টের পায় অন্তর্যামীর মতো। পরদিন শুধু দেখাই হয় না—এক বাক্স সাবানও নিয়ে আসে হাতে করে।

টাকাগুলোর কথা কিন্তু ভোলে না কনকলতা। প্রায়ই মনে করিয়ে দেয়।

—অনেক যে জমে গেল কুমারদা। আসছে মাসের টাকাটা হাতে এলেই—

—ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? ওগুলো হয় রেস্তোরাঁ, নইলে সিনেমাতেই বাজে খরচ হত। তোমার কাছে বরং সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা করে রেখেছি। দরকার হলে চেয়ে নেব।

থাকুক সেভিংস ব্যাঙ্কে—কনকলতার সুবিধেই হয়। বাবা হঠাৎ মারা গেলেন অল্প মাইনের চাকরি করতেন—পৈতৃক বাড়িখানা ছাড়া আর কিছুই রেখে যান নি। বিধবা মা, দু-তিনটি ছোট ছোট ভাইবোন। বি. এ. পরীক্ষা দেবার আগেই কনকলতাকে চাকরি নিতে হল। সবশুদ্ধ শ' দেড়েক টাকা আয়—ডাইনে রাখতে বাঁয়ে কুলোয় না।

এরই মাঝখানে কুমারদা এসে পড়েছেন দেবদূতের মতো। এ-সব টাকা তো এমনিই পড়ে থাকত ওঁর কাছে। তবু কিছুদিন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারছে কনকলতা। পূজোর সময় যদি কিছু বোনাস্ পাওয়া যায়, তা হলে খানিকটা মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করবে। তবে যে রকম মানুষ কুমারদা—নিতে চাইলে হয়।

কুমারকান্তির তোষকের তলায় অসন্তুষ্ট চিঠিগুলো মধ্যে মধ্যে খচ্ খচ্ করে ওঠে। ওগুলোকে এক সময় আগুন জ্বালিয়ে ছাই করে দিলেই হয়--প্রায়ই ভাবে কুমারকান্তি। পোড়ো বাড়ির মতো পুরনো পৈতৃক ভদ্রাসন। কেরোসিনের লালচে আলোয় মশার গুঞ্জন। জংলা আমবাগানে বুনোগন্ধভরা অন্ধকার। চিঠি-গুলোকে অমন করে জমিয়ে রাখবার কোনো মানেই হয় না।

এরই মধ্যে নিমন্ত্রণ এল কনকলতার।

--এ রবিবারে কিন্তু যেতে হবে আমাদের ওখানে। মা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

কলকাতা নয়, ঠাসাঠাসি ভিড় নেই লাখ লাখ মানুষের, পুরনো বটের ছায়ায় অনেকখানি চওড়া একটা বাঁধানো ঘাট। সামনে উজ্জ্বল উদার গঙ্গা। দুজনের নির্জনতায় পাশাপাশি বসে থাকা যায় অনেকক্ষণ।

শনিবারের রাত্রে কলে জল পড়বার অসহ্য আওয়াজটা পর্যন্ত শুনতে পেল না কুমারকান্তি। তোষকের তলাটা আশ্চর্য নীরব। পাশের তক্তপোষে কপালে আঁবওলা ডোরাকাটা লুঙ্গিপরা ভদ্রলোকের একবারও নাক ডাকল না খুব সম্ভব।

--এই বাড়ি?

--এই বাড়ি।

স্টেশনের কাছাকাছি পাড়া। ঘর-বাড়িগুলো কলকতার মতো গায়ে গায়ে লাগা। গঙ্গা? সে এখানে নয়---অনেকটা দূরে। কেন যে একটুখানি ম্লান হয়ে গেল কুমারকান্তি নিজেই জানে না।

রেলিং দেওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল কনকলতা। একরাশ

মেলে-দেওয়া চুল। নীল শাড়ির আঁচল তেমনি শক্ত করে কোমরে জড়ানো।

—আসুন কুমারদা, আসুন।

বাইরের ঘরে পা দিলে কুমারকান্তি। বার্নিশ-কালো-হয়ে-যাওয়া জীর্ণতার ছোপ-লাগা টেবিল-চেয়ার। একটা পরিচিত গন্ধের আভাসে তার স্নায়ুগুলো চকিত হয়ে উঠল হঠাৎ। সেই পুরনো চুন-বালির গন্ধ।

কেমন সংকীর্ণ হয়ে একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল সে।

—এলেন তা হলে শেষ পর্যন্ত!—সামনের টেবিলের কোণা ধরে দাঁড়াল কনকলতা—খুশিতে চক্ চক্ করছে চোখ। তবু কোথায় যেন কী একটা ফাঁকা থেকে যাচ্ছে মনে হল কুমারকান্তির। কিছু যেন ঘন হয়ে আসছে না—কেমন তরলভাবে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

—আসব না? তুমি ডেকে পাঠিয়েছ!—কথাটা বলতে গিয়েও স্বর বদলে গেল গলায়ঃ তোমার মা ডেকেছেন—

—তুমি আসবে জেনে কী যে খুশী হয়েছেন মা। শরীর ভালো নেই, তবু নিজেই রাঁধতে বসেছেন। দাঁড়াও, খবর দিই।—যেন উড়তে উড়তে বেরিয়ে গেল কনকলতা।

কালো চেয়ারটায় নড়ে বসল কুমারকান্তি, কেমন কিচ্ কিচ্ করে শব্দ হল একটা। পুরনো চুন-বালির আবছা গন্ধ। ভারী গরম লাগছে। হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে রুমালটা খুঁজে পেল না—ফেলে এসেছে বেরুবার সময়।

চিন্তার ফাঁকা জায়গাটা ভরে উঠবার আগেই কলরবে চমকে উঠল কুমারকান্তি। বছর বারো আর বছর পাঁচেকের দুটি ছেলে আর বছর সাতেকের একটি মেয়ে এসে ঢিপ্ ঢিপ্ করে প্রণাম করছে তার পায়ে।

—এ কি! এ কি! থাক্!—তটস্থ হয়ে কুমারকান্তি উঠে দাঁড়াল।

—থাকবে কেন বাবা? তুমি ওদের বড় ভাইয়ের মতো, প্রণাম করবে বইকি।—কনকলতার মা ঘরে পা দিয়েছেন। শীর্ণ ক্লান্ত চেহারা। শান্ত বিষণ্ণ মুখের ভঙ্গিতে আশ্চর্য মিল আছে মেয়ের সঙ্গে।

এবার প্রণামের পালা কুমারকান্তির।

—হয়েছে বাবা, বোসো।—অকৃত্রিম স্নেহ ঝরে পড়ল মায়ের গলা থেকে: বড় ছেলে আমার ছিল না, ভগবান তোমায় জুটিয়ে দিয়েছেন। মেয়েটা সেই কথাই বলে।

ঘর্মাক্ত মুখে কুমারকান্তি বসে পড়ল। গঙ্গা এখান থেকে অনেক দূর। পুরনো বাঁধাঘাটের চওড়া সিঁড়ির উপর বটের ছায়া পড়েছে কিনা, এখান থেকে সে-কথা বলবার উপায় নেই।

মা বলে চললেন, তোমার দেওয়া কাপড়খানা পেয়ে মেয়ের সে কী আনন্দ! পাড়াসুদ্ধ সকলকে ডেকে ডেকে দেখিয়েছে; বলেছে, কুমারদা দিয়েছেন। ছেলেমেয়েগুলো আর কত খাবে চকোলেট,—এ-বাড়ির ও-বাড়ির বাচ্চাদের বিলিয়েছে। তুমি এসেছ জানতে পারলেই পাড়ার সবাই দেখতে আসবে তোমাকে।

চেয়ারের উপরে আর একবার নড়ে উঠল কুমারকান্তি। গরম—অসহ্য গরম। কলকাতার চাইতেও ঢের বেশি ভিড় এখানে। কলকাতায় অনেকের ভিতরে দুজনের জন্যে একটুখানি অবসর গড়ে ওঠে, কিন্তু এখানে সকলের চোখ এড়িয়ে একটু আড়াল পাওয়ার সুযোগ নেই কোথাও।

এইবার ফিরে এল কনকলতা। হাতে বাঁধানো ফোটো একখানা।

—চিনতে পার কুমারদা?—আনন্দে ছল ছল করে উঠল কনকলতা: কেমন সুন্দর করে বাঁধিয়েছি ছাখো।

কুমারকান্তি তাকিয়ে রইল ভাসা ভাসা চোখ মেলে। সেই ফোটো। প্রায় দশটা টাকা খরচ করে তুলিয়েছিল। স্টুডিও

থেকে। সারাদিন একটা নীল কাগজের মোড়কে বয়ে বেড়িয়েছিল বুকের কাছে। তারপর সাড়ে পাঁচটার ট্রেনটা নড়ে উঠলে কাঁপা হাতে সেটা সে ফেলে দিয়েছিল কনকলতার কোলের উপর, আর পরক্ষণেই পিছন ফিরে দ্রুত বেরিয়ে এসেছিল প্ল্যাটফর্মের বাইরে।

তেমনি অর্থহীন চোখে কুমারকান্তি চেয়ে রইল। কনকলতা বলে চলল, একটা ভারি অন্যায় হয়ে গেল কিন্তু। পিছনে তুমি আমার নামটা লিখে দিয়েছিলে---বাঁধাতে গিয়ে সেইটে ঢাকা পড়ে গেল। না মা?

বালিশের নীচে নয়, সুরভিত কোনো মেয়েলী বাক্সের নিভৃত নিমগ্নতায় নয়, কোনো ভুরু ভুরু অবকাশের একান্ততাতেও নয়। এই ছবি এখন ঝুলতে থাকবে দেওয়ালে, শোভা পাবে মা-কালীর পট আর জপের মালা হাতে ঠাকুরমার পাশাপাশি। নগ্ন নিরাবরণ দেওয়ালে এখন ছবি হয়ে থাকবে কুমারকান্তি। কালী প্রণাম পাবেন, আর সে পাবে এক মুঠো কৃতজ্ঞতা।

এ কোথায় এল কুমারকান্তি—এ কী বীভৎসভাবে উদ্‌ঘাটিত হয়ে গেল সে! ইচ্ছে করেই এ-সব করেছে কনকলতা। কলকাতার একগুচ্ছ রঙিন অন্ধকারকে এখানে নিয়ে এসে হাস্নুহানার টুকরো টুকরো ছেঁড়া পাঁপড়ির মতো উড়িয়ে দিয়েছে হাওয়ায়। ওই ফোটোটা কেড়ে নিয়ে এক আছাড়ে চুরমার করা যায় না?

—ও কনক, তোর কলকাতার কুমারদা এল? -মোটা ভরাট গলায় কে এক ভদ্রমহিলা ডাকলেন।

---ওই যে, পাশের বাড়ির মাসিমা দেখতে এসে গেছেন তোমাকে।—ভারি উৎসাহিত মনে হল কনকলতাকে।

আর তক্ষুনি—ঠিক সেই মুহূর্তেই—কোথায় ঝর ঝর করে কলে জল পড়বার আওয়াজ এল। সেই 'মেণ্ট্যাল অ্যালার্জি'র অঙ্কুশ-তাড়নায় স্প্রীঙের পুতুলের মতো লাফিয়ে উঠল কুমারকান্তি।

অসহ্য—অসহ্য। আর এক সেকেণ্ডও অপেক্ষা করা সম্ভব নয় এখানে।

—এই যাঃ, একটা ভুল হয়ে গেছে!—এক লাফে বাইরে নেমে পড়ল সে। পিছনে কী যেন চেঁচিয়ে উঠল কনকলতা; মা যেন কী বলতে চাইলেন; কিন্তু একটা কথাও সে শুনতে পেল না আর। ঊর্ধ্বশ্বাসে স্টেশনের দিকে ছুটতে লাগল, একটা প্রেতসঙ্গীর মতো তার ছু' কানে বয়ে চলল মুখুজ্যের কণ্ঠস্বর: তুমি বিয়ে করেছ, তোমার ছেলেপুলে রয়েছে—

* * * *

হলদে দেওয়ালের গায়ে লাল লেটার-বক্সটার সামনে এখনো পায়চারি করছে কুমারকান্তি। চিঠির কোণাটা ভিজে যাচ্ছে হাতের ঘামে। ভূতুড়ে হাতের মতো নিমের অষ্টাবক্র ডালে কতকগুলো কাক বসল, উড়ে গেল—তবু সে চিঠিখানাকে ফেলে দিতে পারল না এখনো।

একটু দূরেই কর্পোরেশনের একটা জলের কল। রোদের আলোয় বিকেলের রঙ লেগেছে—গুর্ গুর্ করে একটা চাপা আওয়াজ হচ্ছে তার ভিতরে। আরো খানিক পরেই—হয়তো মিনিট তুয়েক পরেই—ঝর ঝর করে জল পড়তে শুরু করে দেবে। আর তৎক্ষণাৎ—তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো চমকে উঠবে কুমারকান্তি; আঙুল-ছোঁয়ানো ট্রিগারে টান পড়ার মতো কোণা-ভিজে খামটা বন্দুকের গুলি হয়ে ছিটকে বেরিয়ে যাবে তার হাত থেকে।

দেনা

এবং কী পরিতাপ—বাড়িতে একটা রেডিয়ো নেই!

স্বামী তখন এক টাকার বাজার এনে নামিয়েছেন ঘরের দাওয়ায়। তিন ছটাক মাছ, প্রায় স্বচ্ছ একটি লাউয়ের ফালি, এক পোয়া আলু আর বাজারের বাইরে থেকে সস্তায় কেনা গোটা-কয়েক অসুস্থ চেহারার বেগুন। উদ্বৃত্ত তিন পয়সায় কেনা বিড়ি থেকে একটা সবে ঠোঁটে দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় স্ত্রীর আক্রমণে হকচকিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। এমন অদ্ভুত নিরীহ চোখ মেলে চেয়ে রইলেন যে মনে হল হিব্রু ভাষা শুনছেন।

—এখন? এখন কী?—উত্তেজিত ভাষায় লতিকা জিজ্ঞেস করলেন: কী হবে এবার?

—কিসের কী হবে?—শিবদাসবাবু তখনো বিস্ময়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন: ব্যাপারটা কী?

লতিকা এবার গলা তুললেন। দোতলার অহঙ্কারে মট্ মট্ করা মোটা গিন্নীকে শোনাবার মতো করে স্বরগ্রাম ওপরে তুলে দিয়ে বললেন, উমা রেডিয়োতে প্রোগ্রাম পেয়েছে।

—অ্যাঁ!—পঁচানব্বুই টাকা মাইনে আর পঁয়ত্রিশ টাকা ডি-এ-র শিবদাসবাবু এমন একটা ধ্বনি তুললেন যে, সেটা আতঙ্ক না উল্লাস ভালো করে বোঝা গেল না।

—এই ভ্যাখো।—সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী নামাঙ্কিত এবং সার্ভিস লেখা স্ট্যাম্প-আঁটা মেটে রঙের খামখানা লতিকা এগিয়ে দিলেন স্বামীর দিকে। আবার দোতলার মোটা গিন্নীর কানে মধু বৃষ্টি করে চড়া পর্দায় জানালেন: বারোই এপ্রিল। বেলা দুটোর সময়। পনেরো মিনিটের প্রোগ্রাম—পনেরো টাকা পাবে।

রাত ছুটোর সময় হঠাৎ একখানা অনিশ্চিত এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম এলে যে আতঙ্ক আর উত্তেজনা নিয়ে মানুষ খাম ছেঁড়ে, তেমনি ভাবেই কাঁপা হাতে ছাপানো ফর্মের ওপর টাইপ করা চিঠিখানা খুললেন শিবদাস। বাঁ হাত দিয়ে চশমাটা ঠিক করে নিলেন, তারপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন। একবার, ছুবার, তিনবার, চারবার।

না, কোনো ভুল নেই। উমা দত্ত, কেয়ার অব্ শিবনাথ দত্ত, সাতের পাঁচ পটলডাঙা লেন, কলকাতা-নয়। আর কেউ হতেই পারে না।

হঠাৎ যেন চোখ ছুটো কেমন ঝাপসা হয়ে যেতে চাইল শিবদাসের।

—উমা ? উমা কই ?

উমা দাঁড়িয়ে ছিল দরজার পাশেই। সুখে আর আনন্দে তার পাখির মতো উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কেমন একটা লজ্জাও হচ্ছে এখন— পা জড়িয়ে যাচ্ছে যেন।

শিবদাস আবার ডাকলেন : উমা —উমা কোথায় ?

উমা বেরিয়ে এল এবার। কালো রোগা চেহারার মেয়ে— বিয়ের বাজারে যারা প্রথম দৃষ্টিতেই বাতিল হয়ে যায়। সামনে এসে দাঁড়াল মাথা নিচু করে।

শিবদাস কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সত্যিই চোখ ছুটো ঝাপসা হয়ে যেতে চাইছে। কাল সন্ধ্যেবেলাতেই কুড়ি বছরের এই কুদর্শনা অনূঢ়া মেয়েটির মৃত্যু কামনা করছিলেন শিবদাস : মাত্র সাড়ে সাত টাকা দিয়ে মাসের শেষ পাঁচ দিন কী করে চালাবেন, তার সূক্ষ্ম হিসেব করতে বসে উমার গলা সাধবার উৎপাতে হিংস্র হয়ে ভাবছিলেন, এক আছাড়ে ওর তানপুরাটা ভেঙে দেবেন কিনা! কিন্তু এখন---

অনুতাপের একটা বোবা বেদনা শিবদাসের বুকের ভেতরে লতিয়ে লতিয়ে উঠতে লাগল। আশ্চর্য সুন্দরী মনে হল এই শীর্ণদেহিনী কুরূপা মেয়েটিকে। কালো? যদি দুখানা ভালো সাবানও কোনোদিন কিনে দিতে পারতেন তা হলে এই কালো থেকেই আলো ঠিকরে বেরুত। যদি পেট ভরে এক মুঠো খেতে দিতে পারতেন, তা হলে এই কালো মেয়েই ফুটে উঠত কৃষ্ণকলির মতো।

চোখে জল আসছে নাকি? সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলেন শিবদাস। ধরা গলায় বললেন, দে—দে, শিগ্‌গির ডুপ্লিকেট্‌টা সই করে দে। আমি এক্ষুনি রেজিস্ট্রি করে দিয়ে আসি।

উমা মৃদুভাবে বললে, ব্যস্ত হচ্ছ কেন বাবা, সাত দিনের মধ্যে পাঠালেই তো—

—না—না, পোস্ট অফিসকে বিশ্বাস নেই।—শিবদাস প্রগল্‌ভ হয়ে উঠলেন। ওরা বনগাঁর চিঠি বম্বেতে নিয়ে গিয়ে ডেলিভারি দেয়। দে শিগ্‌গির সই করে- আমি এখুনি রেজিস্টার্ড পোস্টে পাঠিয়ে দিয়ে আসছি। আর বসন্তকেও খবরটা দিয়ে আসি এই সঙ্গে।

উমা চিঠিটা নিয়ে ঘরে ঢুকল। হাতের সইটা কেমন আঁকাবাঁকা হয়ে যাচ্ছে তার। ডুপ্লিকেট্‌টা ছিঁড়ে দিতেও মায়া লাগছে— মনে হচ্ছে কেমন অঙ্গহানি হয়ে যাবে এমন সুন্দর চিঠিটার।

আর—আর বসন্তদা! সবাই যখন ঠাট্টা করত, যখন পাড়ার তিন চারটে ছেলে শুনিয়ে শুনিয়ে তার গানকে ভ্যাংচাত, তার ওপর মা-র অসীম বিশ্বাসও মধ্যে মধ্যে টলে উঠত যখন, তখন শুধু বসন্তদাই হাল ছাড়ত না। বলত, হবে—নিশ্চয়ই হবে তোমার। গান গলায় তোমার আছেই, কেবল তাকে আর একটু পথ করে

দিতে হবে, সুরের ভেতর আরো একটু খেলতে দিতে হবে। নাও, ধরো তানপুরা। হ্যাঁ, খেয়াল আছে তো? এটা ঝাঁপতাল—

এক টুকরো চিঠিও লিখে দিলে কেমন হয় বসন্তদাকে? ছোট্ট একটুখানি চিঠি?

কিন্তু সময় পাওয়া গেল না। বাইরে থেকে শিবদাসের হাঁক এল: কই রে, এত দেরি হচ্ছে কেন? আমার যে আবার ওদিকে অফিসের বেলা হয়ে যাবে?

বসন্তদাকে চিঠি আর লেখা হল না।

শিবদাস বেরিয়ে গেলেন দ্রুত পায়ে। আর দোতলার মোটা গিন্নীকে শুনিয়ে শুনিয়ে লতিকা বলে চললেন, মেয়েটা রেডিয়োতে গান গাইবে—আর বাড়িতে একটা রেডিয়ো নেই! কতবার বলছি, কেনো—কেনো একটা, তা এমন হাড়কেপ্পন—কিছুতেই কিনলে না!

দরজার পাশে দাঁড়িয়ে কুঁকড়ে গেল উমা। মা যে কখনো বাবাকে রেডিয়ো কিনতে বলেছিলেন এবং একশো ত্রিশ টাকা রোজগারের বাবা ইচ্ছে করলেই যে একটা রেডিয়ো কিনতে পারেন, এমন আশ্চর্য খবর উমা এই প্রথম শুনল।

—আঃ, চুপ করো মা।

বাজারের তরকারী ঝাঁকায় তুলতে তুলতে লতিকা ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন: কেন চুপ করব? রেডিয়ো থাকলে কি আর ভাবনা ছিল? নিজের মেয়ের গান ঘরে বসেই শুনতে পেতাম। তা না-ই রইল। যারা রাতদিন বসে বসে রেডিয়ো বাজায়—তাদের ক'জনের মেয়েই বা প্রোগ্রাম পায় শুনি?

শেষের শব্দভেদী বাণটা দোতলার মোটা গিন্নীর উদ্দেশেই। কিন্তু ও-পক্ষ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। মোটা গিন্নীর নিশ্চয়ই মাথা ধরেছে এতক্ষণে এবং কপালে অডিকলোনের পটি লাগিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিয়েছেন তিনি।

বসন্ত এল বিকেলবেলাতেই। এক মুখ প্রসন্ন হাসি হেসে বললে, ভারি খুশি হয়েছি উমা।

উমা পায়ের ধুলো নিলে বসন্তের : সব আপনার জন্যেই বসন্তদা।

—আমার জন্যে ? না—না।—বসন্তের মুখে হাসিটা লেগেই রইল : তোমার নিজের ভেতরেই শক্তি ছিল। আজ হোক কাল হোক তোমার যা পাওনা, সে তুমি পেতেই।

উমা বসন্তের দিকে তাকাল। সে নিজে কুরূপা—কিন্তু তার চাইতেও কুৎসিত আর কদাকার বসন্তের চেহারা। একটা চোখ একেবারে শাদা—সে চোখে সে দেখতে পায় না। বাঁ গালটা কী করে পুড়ে গিয়েছিল, খানিক চামড়া তাল-পাকানো কাগজের ভাঁজের মতো কুঁচকে আছে সেখানে। দু হাতের অস্থিসার আঙুলগুলো সব সময়েই অল্প অল্প কাঁপে—কোনো স্নায়বিক ব্যাধি আছে নিশ্চয়।

তবু তার আজকের এই সৌভাগ্য বসন্তের জন্যই। বসন্তই তার গানকে জাতে তুলে দিয়েছে।

শিবদাসবাবুর বাড়িতে বসন্ত প্রথম এসেছিল কী একটা দূরতম আত্মীয়তার সূত্রে। আর দেখেই আঁতকে উঠেছিল উমা।

-মাগো, কী বিশ্রী চেহারা লোকটার! যেন তালগাছ থেকে নেমে এসেছে!

শিবদাস বলেছিলেন, না না, ছেলেটা খুব ভালো। আর খুব বড় গাইয়ে।

গাইয়ে! সে পরিচয় পেতেও দেরি হয় নি। অদ্ভুত ভাঙা গলা—গান গাইলে মনে হয় গোঙানি। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সেদিন সামনে থেকে পালিয়ে গিয়েছিল উমা।

তারপর আস্তে আস্তে ওই কদাকার মূর্তি আর বিকৃত কণ্ঠস্বরের

আড়াল সরিয়ে আর একজন বসন্ত আত্মপ্রকাশ করল। কী বিচিত্র জীবন এই মানুষটার! কবচ-কুণ্ডলের মতো অপরূপ সুরেলা গলা নিয়েই জন্মেছিল। নিজের সুরই কস্তুরী হরিণের মতো দিশেহারা করল তাকে। স্কুলের মাইনের টাকা নিয়ে উঠে পড়ল লক্ষ্ণৌয়ের গাড়িতে—সেখান থেকে দিল্লী। বারো বছর পরে ফিরল কলকাতায়—তখন সে দস্তুরমতো ওস্তাদ।

পেছনে জোর ছিল না—তাই রেডিয়ো-রেকর্ডে সুযোগ পেল না। শুরু করল গানের ট্যুশন। হাওড়া থেকে বেলেঘাটা, শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জ। তারও পরে মেনিনজাইটিস। একটা চোখ শাদা হয়ে গেল—গলা থেকে নিশ্চিহ্ন হল গান।

গান গেল—কিন্তু সুর রয়ে গেল। কাটা হাতে আর তুলি উঠল না—কিন্তু মনে রইল রঙের মেলা। ট্যুশনের বাজার কেড়ে নিলে অন্তঃসারহীন সুকণ্ঠের দল। বারো বছরের সঞ্চয় নিয়ে রত্ন-ভাণ্ডারের যখের মতো পড়ে রইল বসন্ত।

শুধু রাজা লেনের বস্তির ঘরে যারা তার সন্ধান রাখত—তারাই দু-চারজন এল এগিয়ে। অদ্ভুত বিকৃত গলায় বসন্ত তাদের হাতে তুলে দেয় সুরের চাবি, মণি-ভাণ্ডার থেকে যা পারে তারা কুড়িয়ে নেয় দু হাতে। আর এল উমা। শুধু দূরতম আত্মীয়তার সূত্রেই নয়—উমার গানে বসন্ত জাত-শিল্পীর সন্ধান পেল।

চার বছর ধরে ইস্পাতে বসন্ত শান দিয়েছে; শ্রান্তিহীন চেষ্টায় সোনার তারের মতো উজ্জ্বল আর মসৃণ করে দিয়েছে উমার গলা। শিবদাসবাবুর মুখ এক এক সময় বিকৃত হয়ে উঠেছে, কেবল পয়সা দিতে লাগে না বলেই সহ্য করে গেছেন কোন মতে। কখনো কখনো লতিকা পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছেন, এখন তোর ওই হা-হা-হা-হা বন্ধ কর বাপু, কান যে ঝালাপালা হয়ে গেল! সকালে রেওয়াজ শুরু করলেই পাড়ার কয়েকজন রসিক ছেলে শেয়াল ডেকে

উঠেছে একসঙ্গে। দোতলার মোটা গিন্নীর গর্জন শোনা গেছে: আর তো এ জ্বালা সহ্য হয় না—কর্পোরেশনে একটা খবর দিলে হয়। সকাল-সন্ধ্যে ওই মড়াকান্না শুনতে শুনতে পাড়ার কাক-চিলগুলো পর্যন্ত ভয়ে সিঁটিয়ে গেল যে!

তবু উমা থামে নি—বসন্তই থামতে দেয় নি তাকে। পাড়ার ছেলেদের উৎপাতে এক-একদিন কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে উমা, বলেছে, আপনি মিথ্যেই চেষ্টা করছেন বসন্তদা, আমার কিছু হবে না। উত্তরে কদাকার মুখে সস্নেহ হাসি হেসেছে বসন্ত: তোমার যদি না হয়, তা হলে কারো হবে না উমা। অনেক তপস্যা না করলে দেবতা প্রসন্ন হন না—সরস্বতীর বর পেতে গেলে তোমায় আরো কিছুদিন কষ্ট করতে হবে বই কি।

সেই তপস্যার আজ প্রথম ফল। রেডিয়োতে প্রথম প্রোগ্রাম। বসন্তেরই জিৎ হয়েছে আজকে।

উমা তাকিয়ে রইল বসন্তের দিকে। যেমন ভাবে সকালে শিবদাস আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনি করে সেও যেন দেখতে পেল। ভারি সুন্দর ভারি স্নিগ্ধ বসন্তদার মুখখানা।

লতিকা ঘরে ঢুকলেন: এই যে বসন্ত, কখন এলে?—উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, শুনেছ তো খবর? দেখেছ চিঠিখানা?

উমা হাসল: চিঠি আর কী করে দেখবেন মা? তুমিই তো ওটা হাতে করে এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছ! লতিকা লজ্জা পেলেন, খামখানা বাড়িয়ে দিলেন বসন্তের দিকে। স্বল্প-শিক্ষিত বসন্ত ঠোঁট বিড় বিড় করে, ইংরেজী শব্দে হোঁচট খেতে খেতে কোনো মতে পড়ে ফেলল চিঠিটা। শাদা চোখটা পর্যন্ত যেন খুশিতে জ্বলে উঠল তার।

লতিকা উমার কথারই প্রতিধ্বনি করলেন: সবই তোমার জন্যে বাবা। তুমি এমন করে লেগে না থাকলে কিছুতেই কিছু

হত না। শেষ পর্যন্ত মেয়েটা তবু তোমার মুখ রেখেছে। তা একটু বোসো তুমি—আমি চা করে দিই, ছুটো মিষ্টিও আনাই তোমার জন্যে।

বসন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বললে, থাক্ থাক্, আপনি বিব্রত হবেন না। আমার গ্যাসট্রিক গোলমাল আছে—বাজারের খাবার সহ্য হবে না। তার চাইতে উমার প্রোগ্রামটা ভালো করে হয়ে যাক—আমি এসে ওর রান্না পেট ভরে খেয়ে যাব।

—সে তো খাবেই, নিশ্চয়ই খাবে।—আনন্দে প্রায় তরল হয়ে গেলেন লতিকা: তোমাকে খাইয়েই তো পুণ্যি। তোমার জন্যেই তো ও আজ দশজনের একজন হতে পেরেছে।

বসন্ত হাসল: না মাসিমা, দশজনের একজন হতে এখনো কিছু দেরি আছে ওর। এ তো সবে শুরু। এখনো অনেক খাটতে হবে—বিস্তর তপস্যা করতে হবে।

লতিকা কী বলতে চাইছিলেন, কিন্তু থেমে গেলেন। সকালে এক তরফা বাণ বর্ষণ করেছিলেন, এবার ও-পক্ষ থেকে তীর আসতে শুরু হয়েছে।

মোটা গিন্নীর কলেজে-পড়া গোলগাল মেয়ে রুনকি সিঁড়ির মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আকাশকে কথা শোনাতে লাগল: ভারি তো পনেরো মিনিটের প্রোগ্রাম—তায় আবার ছুপুরে! ছুপুরবেলা তো ঝড়তি-পড়তি গাইয়েদের ওরা প্রোগ্রাম দেয়—পানওলা আর রাস্তার ঝাঁকামুটে ছাড়া সে গান কেউ তো শোনে না।

সারাদিনের পর এতক্ষণে মোটা গিন্নীর দরাজ গলা গম গম করে উঠল: তারই চোটে তো সারাদিন কাড়া-নাকাড়া বাজছে। কাল থেকে রাস্তায় বোধ হয় পোস্টার পড়বে।

ঝগড়ার উৎসাহে লতিকার ছুই চোখ দপ করে জ্বলে উঠল।

—শুনলে বসন্ত, নিজের কানেই তো শুনলে?—স্বরগ্রাম এক

দেন।

পর্দা চড়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই : হিংসেয় বুকের ভেতরটা একেবারে জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে, তাই—

বসন্ত বাধা দিলে। শান্ত হাসি হেসে বললে, কেন ও-সবে কান দিচ্ছেন মাসিমা! ও-সব কথার উত্তর ঝগড়া করে দেওয়া যাবে না—উমা সত্যিকারের বড় গাইয়ে হয়ে তবেই ওর জবাব দেবে। আপনি আমার জন্যে চা আনবেন বলেছিলেন, নিয়ে আসুন।

আজ সেই দিন সেই বারোই এপ্রিল।

বাড়িতে একটা রেডিয়ো নেই—সেই দুঃখে মরমে মরে যাচ্ছিলেন লতিকা। হঠাৎ কোথা থেকে বসন্ত এসে হাজির। শরীর ঘামে ভেজা, বগলে লোক্যাল সেট রেডিয়ো একটা।

উমা বললে, এ কি বসন্তদা! এ আবার কোত্থেকে আনলেন?

কপালের ঘাম মুছে বসন্ত বললে, আমার এক বন্ধুর দোকান থেকে চেয়ে এনেছি। মাসিমার এত শখ তোমার গান শোনার, অথচ শুনতে পাবেন না—তাও কি হয়!

লতিকা উল্লসিত হয়ে বললেন, তা বেশ করেছ বাবা, খুব ভালো করেছ। পরের বাড়িতে কার কাছে শুনতে যাব—কত ঠ্যাকার করবে ঠিক নেই। বেশ হয়েছে। এখন তুমিই একটু ঠিক-ঠাক করে দাও—আমরা তো ওর কিছুই জানি নে।

ঘরের ভেতরেই এরিয়াল খাটিয়ে দিলে বসন্ত। উমা পুরনো টিপয়টা নিয়ে এল, তার ওপরে সাদা ঢাকনিও পেতে দিলে একটা। সাদা প্ল্যাসটিকের ছোট্ট রেডিয়োটা খুশিতে ঝকমক করতে লাগল!

খুট করে সুইচ খুলে দিলে বসন্ত। অজানা গায়কের আধুনিক গান ঢেউয়ের মতো ভেঙে পড়ল ঘরের মধ্যে।

মুগ্ধ হয়ে লতিকা বললেন, কী মিষ্টি আওয়াজ—কী পষ্ট! এর কত দাম হবে বসন্ত?

বসন্ত বললে, কত আর? শ'খানেক হবে বোধ হয়।

—শ'খানেক!—লতিকা নিভে গেলেন।

চৌকির কোণায় বসে গানটা শুনতে লাগল উমা। আধুনিক গান গাইছে। এরাও প্রোগ্রাম পায়! গলায় কাজ নেই—একটু চড়ায় তুললেই বেসুরো হতে যাচ্ছে, অথচ এরাই নিয়মিত গান গেয়ে চলেছে—বাঁধা আর্টিস্ট! আর উমা—

উমা জানে, তার গলাকে সোনার সুতোর মতো মেজে দিয়েছে বসন্ত। সুর তার ওপরে আলোর মতো ঝলমল করে ওঠে। এবারে দেশের মানুষ তার পরিচয় পাবে। এতদিন যা অন্ধকারে লুকিয়ে ছিল, তা এইবার ফুলের মতো ফুটে উঠবে সকলের সামনে। তারপর তারপর একদিন লোকে তারও গানের জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকবে সেটের পাশে। উত্তেজিত হয়ে বলবে, আজকের প্রোগ্রাম মিস করা চলবে না—উমা দত্তের গান আছে সাড়ে ছ'টায়। তারও ছবি ছাপা হবে প্রোগ্রামের বইয়ের মলাটে। ডাক আসবে গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে—নতুন রেকর্ডের তালিকায় তার নাম থাকবে সকলের ওপরে। নানা জলসা থেকে লোক আসবে—আসবে অসংখ্য ভক্তের চিঠি—।

—উমা!—বসন্ত ডাকল। সুর কেটে গেল, ভেঙে গেল স্বপ্ন। আধুনিক গান তখন থেমে গেছে, কে যেন সেতারে সারং বাজাতে শুরু করেছে। এই সকালবেলায় সারং! আশ্চর্য, এরাও প্রোগ্রাম পায়!

—উমা!—আবার ডাকল বসন্ত। পটলডাঙা লেনের একতলা ঘরের ম্লান আলোয় কেমন বীভৎস দেখাল বসন্তকে। একটা চোখ শাদা—যেন চোখের ওপর পাথরের পরকলা পরা। কপালের

দেন।

বাঁ পাশে পোড়া চামড়াটা কুঁচকে রয়েছে, কতকগুলো কালো কালো ক্রিমি যেন জড়াজড়ি করছে এক সঙ্গে। আর একটু সুন্দর হলে কী ক্ষতি ছিল বসন্তদার!

ভেবেই লজ্জিত হল উমা। সুরের জগতে সম্রাট বসন্তদা। দুর্ভাগ্য তার গলা থেকে গান কেড়ে নিয়েছে, তবু অফুরন্ত রত্নের ভাণ্ডার তার কাছে। তা থেকে কতটুকুই বা নিতে পেরেছে সে আজ পর্যন্ত?

—কী বলছিলেন বসন্তদা?

—এসো, গান দুটো আর একবার মহলা দেওয়া যাক।

উমা বললে, আর কী হবে? এতদিন ধরে যা হওয়ার সে তো হয়েইছে, এখন আর—

লতিকা ধমক দিলেন: থাম্ থাম্, বেশি বখামি করতে হবে না। বসন্ত বলছে—আর একবার ঠিক করে নে। আজ ভালো গেয়ে ওদের খুশী করতে পারলে তবে তো ওরা আবার প্রোগ্রাম দেবে।

—আচ্ছা, বসুন বসন্তদা। আমি আপনার জন্যে চা করে আনি।—উমা উঠে দাঁড়াল।

লতিকা বিরক্ত হয়ে উঠলেন: হয়েছে—হয়েছে, তোমায় আর কাজ দেখতে হবে না এখন। এক পেয়ালা চা আমিই এনে দিতে পারব। তুই যা, ভুল-টুল থাকলে এইবেলা ঠিক করে নে—

একটা মৃদু উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উমার সকালটা বয়ে গেল। অডিশন দেবার সময়েই বুকে থরহরি জেগেছিল, এখন কী হবে? সে তো শুধু মাইকের সামনেই গাইছে না—বিদ্যুতের স্রোত বেয়ে তার গান পৌঁছুবে হাজার হাজার মানুষের কাছে। কত গুণী-জ্ঞানী আছে তাদের মধ্যে, কত সমঝদার আছে তাদের দলে। সেই অসংখ্য অগণিত শ্রোতাকে সে কি খুশী করতে

পারবে ? যদি ঘাবড়ে যায়, যদি তাল কাটে, যদি বেস্থুরো হয়ে যায় ? কাল রাত পর্যন্ত যেটা তাকে মাদকতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল—মায়ের হাতে হাতে জীর্ণ হয়ে যাওয়া চিঠিখানাকে সকলের অগোচরে আর একবার লুকিয়ে পড়বার সময় যে ঢেউ তুলেছিল বুকের ভেতর—হঠাৎ তারা সব কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে।

পারবে তো—পারবে তো উমা ?

বসন্তদা বলেছেন, কোনো ভয় নেই। কিন্তু ভরসাই বা কোথায় ? তখন তো বসন্তদা সামনে থাকবে না! অভয় দিয়ে বলবে না—ঠিক হচ্ছে, গেয়ে যাও! সব অপরিচিত—সবাই অনাত্মীয়। স্নেহের চোখ দিয়ে তারা কেউ তাকে দেখবে না—যাচাই করে নেবে। উমার হাত-পা যেন হিম হয়ে আসতে চাইল। হঠাৎ মনে হল, রেডিয়ো-প্রোগ্রাম তার দরকার নেই। একটা ঝড়-বৃষ্টি-সাইক্লোন কিছু হোক—ট্রাফিক বন্ধ হয়ে যাক কলকাতার —উমাকে যেন রেডিয়ো-স্টেশনে যেতে না হয়।

কিন্তু কিছুই হল না। চৈত্র মাসের তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল আকাশে জেগে রইল খরধার সূর্য, ঘড়ির কাঁটা চলল লাফে লাফে, তারপর যথাসময়ে এল বসন্ত।

—একটা পনেরো এখন, রেডি তো উমা ?

সাড়ে বারোটা থেকেই লতিকা উমাকে কাপড় পরিয়ে বসিয়ে রেখেছেন। একটা থেকেই অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন—কেন এখনো আসছে না বসন্ত! আর রেডিয়োর সামনে বসে গান খবর সব শুনছিলেন কান পেতে। সঙ্গে সঙ্গেই তাড়া লাগালেন তিনি।

—নে—নে, তাড়াতাড়ি ওঠ্। ও কি, তানপুরো পড়ে রইল যে! তুমি ওকে একটু উৎসাহ দিয়ো বাবা বসন্ত। যে-রকম ভয় পাচ্ছে—

বসন্ত তার কুৎসিত মুখে খানিকটা সুন্দর হাসি হাসল: কোনো ভাবনা নেই মাসিমা—দেখবেন ও ভালোই গাইবে। মাকে একটা প্রণাম করে নাও উমা—

দুরু দুরু বুকে বসন্তের সঙ্গে বেরুল উমা। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে লতিকা বলতে লাগলেন: দুর্গা—দুর্গা! আহা, উমা আজ প্রথম রেডিয়োতে গাইবে, ওর বাবা কেবল শুনতে পেল না! কী যে পোড়া অফিস—একটা দিনও ছাই ছুটি দেবে না!

ওপর থেকে দোতলার মোটা গিন্নীর একটা চাপা হাসি যেন শোনা গেল। একবার অগ্নিদৃষ্টি তুলে লতিকা অলক্ষ্য মেঘনাদকে খুঁজলেন, তারপর ঘরে এসে রেডিয়োটাকে পুরোদমে খুলে দিয়ে বসে রইলেন ব্যাকুল প্রতীক্ষায়।

কিছুতেই রেডিয়ো-স্টেশনের ভেতরে ঢুকল না বসন্ত। চোরের মতো দাঁড়িয়ে রইল বাইরে।

—আপনি আসবেন না বসন্তদা?

—না না, আমি এখানেই থাকি।

—আমার যে বড় ভয় করছে!—উমার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

—কিছু ভাবনা নেই—চলে যাও ভেতরে।

অগত্যা এগিয়ে গেল উমা। যেতে যেতে বার কয়েক করুণ চোখে ফিরে তাকাল। মাথা নেড়ে নিঃশব্দে উৎসাহ পাঠাল বসন্ত।

মাথার উপর চৈত্রের রোদ জ্বলছে। পথে গলে যাচ্ছে পীচ। হাইকোর্টযাত্রী লক্ষ্মীছাড়া চেহারার ট্রামগুলো কর্কশ শব্দ তুলে ঝাকুনি খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে। বসন্ত হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছে ফেলল একবার। এখনো কুড়ি মিনিট দেরি।

দু পা এগিয়ে এসে দাঁড়াল লালদীঘির রেলিংয়ের পাশে।

টেলিফোনের নতুন শাদা বিশাল বাড়িটা রোদে অদ্ভুতভাবে ঝক-ঝক করছে—কাচের জানলাগুলো থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে হীরের ধার। চারদিকে অবিশ্রাম ক্লান্ত কর্মযাত্রা। বসন্ত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, এরই ভেতরে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে প্রায় ন্যাড়া একটা গাছের ডালে এক জোড়া কাক নিবিষ্ট মনে বাসা বাঁধছে।

উমার চাইতেও চঞ্চল হয়ে উঠেছে বসন্ত। ঘড়ির কাঁটা যত এগোচ্ছে—রক্তের মধ্যে ততই ঝড়ের মতো শন্‌শনানি উঠছে একটা। ধুলোপড়া ময়লা রেলিংটাকে সে মুঠো করে চেপে ধরল। তার হাঁটু দুটো কাঁপছে।

মাথার ওপর গাছের একটা হালকা ছায়া আছে বটে, তবু কী অসহ্য তাপ ঠিকরে আসছে তার ভেতর থেকে! একটা বিড়ি ধরিয়েই ফেলে দিল বসন্ত—বিশ্রী তেতো লাগছে মুখটা। পকেটে হাত দিতে একটা এলাচের খোসা পাওয়া গেল, নির্মমভাবে সেইটেকেই চিবুতে লাগল চুয়িং গামের মতো।

একটা সাতান্ন—একটা আটান্ন—

ঠিক রেডিয়ো-স্টেশনের সামনেই একটা পানের দোকানে রেডিয়ো সেট্ দেখেছে বসন্ত। একটু আগেও সেটা বাজছিল। ঘর্মাক্ত দেহে সেই দিকেই চলল পায়ে পায়ে।

হৃৎপিণ্ডে শীত ধরিয়ে দেওয়া একটা ঘোষণা। তারপর বাজনা। তারপর—

গান গাইছে উমা। হ্যাঁ, উমাই। সেই চেনা গলা—সোনার তারের মতো যাকে মেজে মেজে মসৃণ করে দিয়েছে; সেই সুর—যে সুর দিনের পর দিন শিখিয়েছে একনিষ্ঠভাবে। পারবে তো উমা?

পারছে—চমৎকার পারছে! প্রথম মিনিটখানেক যেন একটু আড়ষ্ট লাগছিল—এখন ঝলকে ঝলকে আলোর মতো বেরিয়ে

আসছে গান। কিন্তু ক'জন শুনছে কান পেতে! বসন্ত একবার ভ্রূকুটি করে তাকাল চারদিকে। ঝরঝরে ট্রামগুলো অসহ্য আওয়াজ তুলে ছুটে চলেছে—পথ-চলতি মানুষগুলো একবারও থেমে দাঁড়াচ্ছে না উমার গানের আকর্ষণে। এমন কি হতভাগা পানওয়ালাটা পর্যন্ত শুনছে না। গানটা—একজন খরিদ্দারের সঙ্গে গল্প করছে সমানে।

বেরসিক!—ক্রুদ্ধভাবে স্বগতোক্তি করল বসন্ত। সত্যিই খুব ভালো গাইছে উমা—এত ভালো এর আগে যেন ও কখনো গায় নি। কিন্তু এমন ত্নম্ ত্নম্ করে কেন তবলা পিটছে তবল্‌চিটা? যেন জয়ঢাক বাজাচ্ছে—খারাপ করে দিচ্ছে গানটাকে।

নিভু'ল সুরের পরিক্রমা শেষ করে উমা এসে থামল। বেশ গেয়েছে—খাসা! আবার একটা ঘোষণাঃ এবার দ্রুতলয়ের গান। অনেক সহজ—অনেক স্বাভাবিক হয়েছে উমা, যেন অনুপ্রাণিত হয়ে উঠেছে।

একটা ছোকরা তাল দিতে দিতে চলে গেল। কথার ফাঁকে ফাঁকে পানওয়ালার মাথা তুলছে আস্তে আস্তে।

বসন্ত বলে ফেলল: বাঃ, বেশ হচ্ছে!

পানওয়ালা ফিরে তাকাল: কিছু বলছেন বাবু?

লজ্জিত হয়ে বসন্ত বললে, না না, ও কিছু না।

গান শেষ হল। চমৎকার উতরে গেছে উমা। প্রথম দিনেই সচরাচর এত ভালো গাইতে শোনা যায় না। আনন্দে গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে অভিনন্দন জানাবার জন্যে বসন্ত গেটের সামনে এসে দাঁড়াল।

পাঁচ মিনিট। দশ মিনিট। বারো মিনিট।

মাথার ওপরে চৈত্রের সূর্য। পথে পিচ গলছে। পানওয়ালার রেডিয়ো থেকে রুক্ষ গলায় পল্লী-সঙ্গীত ভেসে আসছে—ঝুমুর

গাইছে। বসন্তের অসহ্য বোধ হল। ওর নাম ঝুমুর নয়—ঝুমুরের ক্যারিকেচার। ওর চাইতে অনেক—অনেক ভালো ঝুমুর আসে উমার গলায়।

ট্রামের শব্দ। বাসের ভেঁপু। পোড়া তেলের কটু গন্ধ তপ্ত হাওয়ায় ছড়িয়ে যাওয়া মোটর। লক্ষ লক্ষ ধারালো লোহার শিকের মতো রোদের ছোঁয়া। এখনো কেন আসছে না উমা?

উমা এল আরো দশ মিনিট পরে। শার্টের তলায় বসন্তের গেঞ্জিটা যখন ভিজে জবজবে হয়ে গেছে তখন।

কিন্তু একা এল না। সঙ্গে বেরিয়ে এল আর একজন। এই মানুষটিকে অনেকবার দেখেছে বসন্ত। গানের জলসায়—অসংখ্য পত্র-পত্রিকার পাতায়।

সিতাংশু চ্যাটার্জি। দুর্দান্ত আধুনিক গাইয়ে। বাংলা দেশ পাগল হয়ে থাকে সিতাংশুর নামে। উমা খুশিতে ঝলমল করতে করতে আসছে তার সঙ্গে। তার হাতে সবুজ রঙের ভাঁজ করা চেকটা।

উমার দৃষ্টি তখন সুদর্শন দীর্ঘকায় সিতাংশুর মুখের দিকে। অল্প অল্প স্নিগ্ধ প্রশ্রয়ের হাসি হাসছে সিতাংশু। উচ্ছল গলায় উমা বলছে, সত্যি ডুয়েট রেকর্ড করবেন আমার সঙ্গে—সত্যিই?

আর কি দাঁড়ায় বসন্ত? আর কি দাঁড়াতে পারে? একটা চোখ শাদা, কপালে খানিক পোড়া কোঁকড়ানো চামড়া, বিশ্রী ভাঙা গলার স্বর। সিতাংশুর সামনে দাঁড়াবার সাহস আছে নাকি বসন্তের?

চট্ করে সামনের হাইকোর্টের ট্রামটাতেই উঠে পড়ল বসন্ত। উমা দেখবার আগেই। এই নিয়ে তিনজন। মনে মনে জানত, ঠিকই জানত: এবারেও এমনি একটা কিছু নিশ্চয় ঘটবে। কিন্তু আজ দুপুরের রোদের শলায় যেন বিষ মেশানো ছিল। ইডেন-

গার্ডেনের শ্যাওলাভরা বদ্ধ জলটার পাশে মরা ঘাসের মধ্যে পা ছড়িয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে সেই বিষের জ্বালায় জ্বলল বসন্ত। অনেকক্ষণ ধরে।

তারপর বিকেলের গাড়িতে চলে গেল দেশে। বর্ধমানের দূর গ্রামের একটা ভাঙা বাড়িতে কিছুদিন মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকবার জন্যে।

* * * *

পালাটা বসন্ত শেষ করতেই চেয়েছিল। কিন্তু উমাই যে তাকে থামতে দেবে না কে জানত সে কথা?

এক মাস পরে রাজা লেনের সেই খোলার ঘরে দুপুরের ঝিমুনিটা হঠাৎ কেটে গেল বসন্তের। উমাই ডাকছে। কোনো ভুল নেই।

ধড়মড় করে উঠে বসন্ত দরজা খুলে দিলে: এ কি, উমা!

অল্প অল্প হাঁপাচ্ছিল উমা। রেডিয়োটা নামিয়ে রাখল বসন্তের তক্তপোশের কোণায়। মস্ত বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, এটা ফেরত দিতে এলাম।

কেমন অপ্রতিভ আর অপ্রস্তুত হয়ে গেল বসন্ত। সংকোচে কুঁকড়ে গেল।

—তুমি আবার কষ্ট করে আনতে গেলে কেন? আমিই তো যেতাম।

—না, আপনি যেতেন না।—শীর্ণ হাসি হাসল উমা: আজ এক মাসের মধ্যেও যান নি।

বসন্ত ঢোক গিলল: শরীর খারাপ হয়েছিল—দেশে গিয়েছিলাম—

—কৈফিয়ৎ দিতে হবে না বসন্তদা, আমি জানি। এবার বিনা নিমন্ত্রণেই উমা বসন্তের তক্তপোশের কোণায় বসে পড়ল: আর

একটা খবর আছে। আসছে মাসে ফের প্রোগ্রাম দিয়েছে রেডিয়োতে।—সেই মেটে রঙের লেফাফা উমা বের করে আনল এবার দুটো সিটিং। দশ আর পনেরো—মোট পঁচিশ মিনিট।

—ভালোই তো!—বসন্ত খুশি টেনে আনতে চাইল গলায় দেখি—দেখি!

—দেখে কী হবে? উমা খামটা সরিয়ে নিলে: বাবা-মার হাতে পড়বার আগেই এটা তোমার কাছে আমি নিয়ে এলাম বসন্তদা। ভেবে দেখলাম, এ প্রোগ্রাম আমি নেব না। আরো অনেক শিখতে হবে আমাকে—অনেক বাকী এখনো। এ-সব থাক্ এখন—

—ছিঃ—ছিঃ—করছ কী!

কিন্তু বাধা দেবার সময় পেল না বসন্ত। তার আগেই টুকরো টুকরো করে চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলল উমা। অসহ্য বিস্ময়ে বসন্তের একটামাত্র চোখে আর পলক পড়ল না। মুখ দিয়ে যান্ত্রিক শব্দ বেরিয়ে এল: কী করলে উমা—ও কী করলে!

ঘরের বিষণ্ণ ছায়ায় একবারের জন্যে বসন্তের মুখখানা অদ্ভুত কুৎসিত লাগল উমার—হঠাৎ যেন বসন্তকে একটা একচক্ষু দানবের মতো মনে হল; ছেঁড়া চিঠির টুকরোগুলোর দিকে তাকিয়ে নাড়ী-ছেঁড়া যন্ত্রণা আর্তনাদ করে উঠল বুকের মধ্যে।

তারপর আবার শীর্ণ হাসি হেসে উমা বললে, এই ভালো হল বসন্তদা। এখনো তো আমার অনেক শেখা বাকি আছে—ব্যস্ত হয়ে কী লাভ?

অভিনয়

আমার জন্যে চা আনতে দিয়ে প্রদ্যোত বললে, জান বিলেতে এক ধরনের মেয়ে আছে। ভারী অদ্ভুত তাদের পেশা। ধর, তোমার স্ত্রীর সঙ্গে কিছুতেই তোমার বনছে না—তুমি ডিভোর্স চাও। অথচ, ডিভোর্সের জন্যে তুমি কোর্টেও যেতে পারছ না—যথেষ্ট কারণ নেই তোমার পক্ষে। সে-সব ক্ষেত্রে ভারী হেল্‌প্‌ফুল হয় এই সব মেয়েরা। তারা তোমার সঙ্গে এমনভাবে অবাধে মেলামেশা করবে যে ছুদিন পরে তোমার স্ত্রীই গিয়ে আদালতে দাড়াবে ডিভোর্সের জন্যে। তারপর ব্যাপারটি যেই মিটে গেল, মেয়েটি তার ফীয়ের টাকা পেল—সঙ্গে সঙ্গেই সে সরে যাবে তোমার কাছ থেকে। তোমাকে আর চিনবেও না কোনদিন।—প্রদ্যোত হাসল: যদি অবশ্য আবার কখনো তোমার প্রয়োজন না পড়ে।

আমি বললাম, বিলেতে আমি কখনো যাই নি—যাওয়ার সুযোগ হবে বলেও মনে হয় না। কিন্তু হঠাৎ এ গল্প কেন? তোমার নিজের কি ডিভোর্স দরকার হয়েছে নাকি?

—হয়েছে নয়, হয়েছিল। তবে সেটা ডিভোর্স নয়, পুনর্মিলন। আর বিলেত নয়, এ দেশেই।

—মানে? ঠিক বুঝলাম না।

প্রদ্যোত বললে, গত ছ'বছরে আমার পারিবারিক জীবনের তুমি কিছুই শোন নি সুকুমার?

—না, কিছুই নয়। তোমার বিয়ের নেমন্তন্ন খাওয়ার পরে এই প্রথম তোমার সঙ্গে দেখা হল। তুমি তো জান, চাকরির খাতিরে আজকাল আমি কলকাতা থেকে সাত শো মাইল দূরে থাকি।

প্রদ্যোত বললে, ঠিক, মনে ছিল না। তা হলে তোমাকে খুলে বলি। আমার স্ত্রীকে দেখেছ ?

—সেই বিয়ের দিন। সুন্দর চেহারা, ভালো গান গাইতে পারেন।

—আরো অনেক গুণ আছে তার। সত্যি—চমৎকার মেয়ে। অহঙ্কার করছি না সুকুমার। আমার বন্ধুদের মধ্যে আমার মতো স্ত্রীভাগ্য কারো নেই। কিন্তু কী আশ্চর্য জান—সেই স্ত্রীর সঙ্গে বছর দেড়েক আমার প্রায় কোনো সম্পর্কই ছিল না। এমন কি সবাই এ-ও ভেবেছিল—জীবনে আমাদের মধ্যে আর কখনোই কম্‌প্রোমাইজ হবে না।

—সত্যি নাকি ?—আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, এখনো সে অবস্থা চলছে ?

—না।—প্রদ্যোত পরিতৃপ্তভাবে হাসল : শনিবার—মানে গত পরশু আমাদের পুনর্মিলন হয়েছে। সমস্ত কাঁটা মুছে গেছে—ক্ষতচিহ্ন মিলিয়ে গেছে নিঃশেষভাবে। আমরা যেন আমাদের বিয়ের পরের দিনগুলোকে নতুনভাবে খুঁজে পেয়েছি। আর সে ব্যাপারে আমাকে সব চাইতে সাহায্য করেছে কে—জান ? আমারই অফিসের একটি টাইপিস্ট মেয়ে।

—তাই নাকি ? কেমন করে ?

আমাদের চা এল। প্রদ্যোত বলতে লাগল।

ছোট্ট একটু কাটা থেকে শরীরে সেপ্‌টিক হয়, একটা ফুস্কুড়ি থেকে দেখা দেয় ইরিসিপেলাস। আমাদেরও তাই হল।

আমার মা নেই ছেলেবেলাতেই। সেই সময় এক দূর-সম্পর্কের পিসিমা আমাকে মানুষ করেছিলেন। এখন তাঁর বয়েস ষাটের কাছাকাছি, কাশীতে থাকেন।

একাই থাকেন কাশীতে—কেদারের গলিতে একটা ঘর ভাড়া নিয়ে। গঙ্গাস্নান করেন, বিশ্বনাথ আর কেদারের আরতি দেখতে যান—শিবপূজো করেন। আমি তাঁকে মাসে গোটা চল্লিশেক করে টাকা পাঠাই। আরো বেশি দিতে চেয়েছিলাম—পিসিমা নিতে রাজী নন। বলেন, বিধবা মানুষ—এতেই আমার দিব্যি কুলিয়ে যায়।

সব ঠিক চলছিল, হঠাৎ পিসিমা বেরিবেরিতে পড়লেন। খবর পেয়ে আমি কাশীতে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, পায়ের ফুলোটা কমেছে বটে, কিন্তু হার্ট এখনও ভয়ঙ্কর উইক্। একটু সাবধান না হলে আর কিছু সেবাযত্ন না পেলে যে-কোনো সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।

ভেবে-চিন্তে আমি পিসিমাকে কলকাতায় নিয়ে এলাম।

আমার স্ত্রী সবিতা ভারী খুশি হল প্রথমে। দিনকয়েক পিসিমাকে এমনি আদর-আপ্যায়ন করতে লাগল যে, ভদ্রমহিলা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। আমাকে প্রায়ই বলতেন—আহা কী লক্ষ্মী মেয়ে, আর কী মিষ্টি স্বভাব! বউমা যে এম-এ পাস সে-কথা কিছুতেই মনে হয় না।

দিন দশেক মন্দ কাটল না। তার পরেই এলোমেলো হাওয়া বইতে শুরু করল।

একদিন সকালবেলায় পিসিমা একটু কুণ্ঠিতভাবেই আমার ঘরে এলেন। আমি খবরের কাগজ পড়ছিলাম, তাকিয়ে দেখলাম, আলনা থেকে আমার কয়েকটা ময়লা গেঞ্জি আর রুমাল কাচতে দেবার জন্যে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। কিন্তু দরজা পর্যন্ত গিয়েই থেমে দাঁড়ালেন, ফিরে তাকালেন আমার দিকে। যেন কিছু একটা বলতে চান আমাকে।

—কোনো কথা আছে পিসিমা?

পিসিমা আস্তে আস্তে কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, বলছিলাম কি খোকা, বাড়িতে মুরগী-টুরগীগুলো না আনলেই তো পারিস।

আমি হেসে বললাম, কলকাতায় অত বাছ-বিচার চলে না পিসিমা। এখানে ওতে কেউ কিছু মনে করে না।

—হুঁ, তাই দেখছি। তবে বামুনের বাড়িতে মুরগী—

আমি বললাম, মুরগী আজকাল জাতে উঠে গেছে পিসিমা। এ কালের পণ্ডিতেরা বিধান দিয়েছেন।

—তা হবে।—বলে পিসিমা চলে গেলেন।

পিসিমারা ও-রকম বলেই থাকেন, সেজন্য দুশ্চিন্তার কিছু ছিল না। আমি একমনে খবরের কাগজে একটা জটিল রাজনৈতিক প্রবন্ধ পড়তে লাগলাম। কিন্তু একটু পরেই আমার স্ত্রী সবিতা এসে উপস্থিত হল।

—পিসিমার কী হয়েছে বলোতো?

—কেন?

—দিব্যি ভালোমানুষের মতো রান্না চাপিয়েছিলেন, হঠাৎ উনুন নিবিয়ে দিলেন। বললেন, ওঁর শরীরটা ভালো নেই—এ বেলা উপোস দেবেন।

আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, ওঁর হার্টের কোনো ট্রাবল হল নাকি? তা হলে তো একবার ডাক্তারকে খবর দিতে হয়।

সবিতার মুখের ওপর এক টুকরো কালো ছায়া দুলতে দেখা গেল। মৃদু গম্ভীর গলায় সবিতা বললে, ডাক্তারের দরকার নেই—ওঁর রোগটা সাইকোলকিক্যাল।

—তার মানে?

—মানে, বাজার থেকে মুরগী আনতে দেখেই নাক সিঁটকে

বসে ছিলেন। তারপর মাংস চড়িয়ে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে উনুন নিবিয়ে উঠে গেলেন।

—তার মানে অনশন ধর্মঘট ?

সবিতা বিরক্ত হয়ে বললে, ঠাট্টার কথা নয়। কী বিশ্রী ব্যাপার বলো তো ? অকারণে সুস্থ মানুষটা উপোস করে থাকবেন ? ভারী খারাপ লাগছে। তুমি একটু বুঝিয়ে বলো দেখি।

অগত্যা পিসিমার কাছে গেলাম। কিন্তু পিসিমা অসাধারণ বুদ্ধিমতী। মুরগীর ত্রিসীমানা দিয়েই গেলেন না। বললেন, শরীরটা সত্যিই আজ ভালো নেই। এ-বেলা উপোস করলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

আমি ফিরে এসে বললাম, যে-কদিন উনি এখানে থাকেন ও-সব বাড়িতে না আনলেই হবে। দরকার কি ওঁর সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে ?

সবিতা শুধু সংক্ষেপে বললে, হুঁ।—কিন্তু ওর মুখ থেকে মেঘ সরল না।

এইভাবেই সুরু হল। দিন-চারেক পরে অফিস থেকে ফিরে দেখি সবিতা বজ্রবাহিনী হয়ে বসে আছে। পিসিমা পাশের ফ্ল্যাটে গল্প করতে গেছেন।

—ব্যাপার কী ?

ঝাঁঝানো গলায় সবিতা বললে, ছাখো, পিসিমা বড় বাড়াবাড়ি শুরু করেছেন। এটা যে কাশী নয়—কলকাতা, সে-কথা ওঁর মনে রাখা উচিত।

আমি শঙ্কিত হয়ে বললাম, কী হয়েছে ?

সবিতা যা বললে, তা শুনে আমার চক্ষুস্থির হল। আজ দুপুরের পরে সবিতার এক সহপাঠিনী এসেছিল তার স্বামীকে নিয়ে। তারা চা খেয়েছে—গল্প করেছে। পিসিমা দু-একবার

এসে তাদের দেখেও গেছেন। তারপর তারা চলে গেলে সবিতার কাছে এসে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছেন, কেমন বন্ধু তোমার বৌমা? বিয়ে হয়েছে, অথচ কপালে সিঁদুরের ছোঁয়াটুকুও নেই—হাতে শাঁখাগাছটা পর্যন্ত নেই?

সবিতা জবাব দিয়েছে, ওরা ও-সব মানে না পিসিমা। ওরা ক্রীশ্চান।

ক্রীশ্চান! শুনে পিসিমা থ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছেন কিছুক্ষণ। তারপর সোজা ছাতে চলে গিয়ে ট্যাঙ্ক থেকে বাল্‌তিভর্তি গঙ্গাজল নিয়ে এসেছেন। তাই দিয়ে টেবিল-চেয়ার থেকে শুরু করে দরজার পরদা পর্যন্ত পবিত্র করে দিয়েছেন।

শেষ পর্যন্ত পিসিমা যখন দেওয়ালের ছবিগুলোতে অবধি গঙ্গাজল ছিটোতে যাচ্ছিলেন, তখন সবিতা আর থাকতে পারে নি। বাধা দিয়ে বলেছে, ওকি করছেন?

পিসিমা বলেছেন, তুমি থামো বাপু। দু-দিন হল বউ হয়ে এসেছ—এ সংসারের তুমি কী জানো? সাতপুরুষের আচার-বিচার তোমরা মানো বা না-ই মানো, আমাকে মানতেই হবে।

আমি কৌতুকের অট্টহাসিতে সবটা উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করলাম। বললাম, আগে অবশ্য ও-সব বাতিক ওঁর কিছু ছিলই, এই পাঁচ বছর কাশীতে থেকে দেখছি সেটা আরো কিছু বেড়েছে। সে যাক, ও-সব পাগলামির জন্যে তুমি কিছু মনে কোরো না। দু'দিন পরেই তো চলে যাবেন।

সবিতা এবারও সংক্ষেপে 'হুঁ' বলে সামনে থেকে উঠে গেল।

কিন্তু চরম হল সেদিন—যেদিন সবিতার ছোট ভাই মুকুল একটা পিকিনিজ্ কুকুর নিয়ে দিদির সঙ্গে দেখা করতে এল। বাড়ি-ঘরের চারদিক দেখেশুনে কুকুরটার পিসিমার ঘরখানাই সবচেয়ে পছন্দ হল। ঘরের কোণে লক্ষ্মীর আসন ছিল, তাতে

ছিল দু'খানা বাতাসা আর একটা কলা। বাতাসা দুটো খেয়ে আর কলাটার খানিক চিবিয়ে কুকুরটার ভারী ঘুম পেলো। পিসিমার বিছানার ওপরে হরিণের চামড়া পাতা ছিল—সটান তার ওপরে উঠে সে শুয়ে পড়ল। আর ঘুমোবার আগে চামড়াটার ওপরেও সে বেশ খানিকটা দাঁতের ব্যায়াম করে নিলে।

আমরা কেউ খেয়াল করি নি। বসবার ঘরে মুকুল তখন তার এন-সি-সি ক্যাম্পের মজার মজার গল্প বলছে আর আমরা উচ্ছ্বসিতভাবে হাসছি। হঠাৎ বাড়ি খান খান হয়ে গেল পিসিমার চিৎকারে।

ঝাঁটার ঘা খেয়ে কেঁউ কেঁউ শব্দে পিকিনিজ্ ছুটে এল—একটা পা সে খোঁড়াচ্ছে তখন। কুকুরের পেছনে ঝাঁটা হাতে দেখা দিলেন চামুণ্ডামূর্তি পিসিমা। সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কি ভদ্রলোকের বাড়ি—না আর কিছু ?

পরের ব্যাপারটা আর বর্ণনা করে লাভ নেই। কুকুর বগলদাবা করে প্রায় এক দৌড়ে পালিয়ে গেল মুকুল, যাওয়ার আগে বলে গেল, মাই গড্ দিদি—সারা জীবনেও আমি আর ডাফ স্ট্রীটে আসছি না !

পিসিমা টান মেরে হরিণের চামড়াটাকে রাস্তায় ফেলে দিলেন। সারা বাড়িতে ময়লা গঙ্গাজলের বান ডাকল। চাকরটাকে দিয়ে কোথা থেকে গোবর আনালেন—মোজেয়িক ফ্লোরের ওপরে গোবরের এক বিরাট পলেস্তারা লেপে দিলেন।

আমি জানতাম, আজ রাত্রে একটা অঘটন ঘটবে। সারা বিকেল সবিতা চুপ করে রইল, রাত্রে পিসিমার মতো সে-ও অনশন ধর্মঘট করলে। তারপর শুতে এসে জিজ্ঞাসা করলে, পিসিমাকে কবে কাশীতে পাঠাচ্ছ ?

আমি বিপন্ন হয়ে বললাম, এখন কী করে পাঠাই ? ডাক্তার

বলছেন, ওঁর হার্টের অবস্থা এখনো খুব ভালো নয়। একা ওখানে গিয়ে যদি হঠাৎ কিছু একটা হয়ে যায়—

সবিতা একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, তা'হলে একটা কাজ করি। যে-ক'দিন ওঁর হার্ট ভালো না হয়, আমি বরং সেদিন-ক'টা বকুলবাগানে গিয়েই থাকি।

বকুলবাগানে সবিতার বাপের বাড়ি।

আমার মেজাজটা বিশ্রী হয়েই ছিল। এর আগে পিসিমার অনেকগুলো বাক্যবাণ আমাকে হজম করতে হয়েছে, হঠাৎ মনে হল এ ব্যাপারে আমার জন্যে খানিকটা সহানুভূতি বোধ করা উচিত ছিল সবিতার। কিন্তু সহানুভূতি দূরে থাক, সবিতা কাটা ঘায়ে নুন আরো বেশি করে ছিটিয়ে দিচ্ছে।

আমি বলে ফেললাম, জানোই তো পিসিমাকে। কুকুরটাকে একটু সামলে রাখলেই তো চলত।

—আমাদের বাড়িতে কুকুর ছাড়াই থাকে। তাকে অস্পৃশ্য অধম বলে মনে করা হয় না।

—কিন্তু পিসিমা তো তোমাদের বাড়ির লোক নন। তাঁর একটা আলাদা সংস্কার আছে। সে-দিকটাও দেখা উচিত।

সবিতা বিছানার ওপরে উঠে বসল: তা হলে তাঁর সংস্কার নিয়েই তিনি থাকুন। আমি আমার সংস্কারেই ফিরে যাব। তা'ছাড়া তুমি যে পিসিমার এতখানি আঁচলচাপা—এমন মেরুদণ্ডহীন—এটাও জানতাম না। এর পর থেকে তোমার ওপর শ্রদ্ধা রাখা আমার পক্ষে শক্ত হবে।

প্রথম কথাটা তেমন গায়ে মাখি নি, কিন্তু সবিতার শেষ কথাটা কাঁকড়াবিছের ল্যাজের মতো আমার সারা গায়ে যেন বিষের জ্বালা ধরিয়ে দিলে। আমি তীব্রভাবে বললাম, শ্রদ্ধা না রাখতে পারো

—রেখো না। তাই বলে তোমাদের খেয়ালখুশি মাফিক আমি পিসিমাকে এ-অবস্থায় কাশীতে পাঠিয়ে দিতে পারব না।

—বেশ তো—পারবার দরকার নেই। আমাদের মান-অপমানে যখন তোমার কিছু আসে যায় না, তখন তাঁকে নিয়েই সংসার করো—হাওয়ায় চাবুকের আওয়াজের মতো কথাটা ছেড়ে দিয়ে সবিতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—সোজা চলে গেল ছাতের দিকে।

পরদিন সকালেই সবিতা ট্যাক্সি ডেকে রওনা হল বকুলবাগানে। এক পেয়ালা চা পর্যন্ত খেলো না। যাওয়ার আগে একটা কথাও বলে গেল না আমাকে। পিসিমা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার জন্যেই তোর সংসারে এমন অশান্তি হল বাবা। তুই বউমাকে ফিরিয়ে আন, আমি আজই কাশীতে চলে যাচ্ছি।

আমি শক্ত গলায় বললাম, তুমি কেন যাবে পিসিমা? তুমিই—থাকবে এখানে। এবাড়িতে সবচেয়ে বেশি দাবি তোমারই।

পিসিমা বললেন, আমার আর কিসের দাবি বাবা? আমি তো সব বন্ধন কেটে বিশ্বনাথের পায়েই ঠাঁই নিয়েছি। আমাকে ছেড়ে দে। তোরা সুখী হলেই আমার যথেষ্ট—এর বেশি আমি আর কিছুই চাই নে।

আমি জবাব দিলাম না। অফিসে চলে গেলাম।

ট্রামে যেতে যেতে মনে পড়তে লাগল: দু বছর বয়সে আমি মা-কে হারিয়েছিলাম। গ্রাম থেকে এলেন নিঃসম্পর্কীয়া পিসিমা—অসীম স্নেহে আমাকে কোলে টেনে নিলেন। তারপর থেকে একটি দিন আমি মায়ের অভাব বুঝতে পারি নি। কোনোদিন যদি সামান্য একটুখানি জ্বর হয়েছে—তা হলেই পিসিমার আহার-নিদ্রা থাকে নি, চব্বিশ ঘণ্টা আমার মাথার কাছেই বসে থাকতে দেখেছি। পনেরো ষোলো বছর বয়সে একবার শক্ত রকমের

টাইফয়েড হয়েছিল—পিসিমা তখন কেবল সেবা করেই ক্ষান্ত থাকেন নি, কালী-বাড়িতে বুকের রক্ত দিয়ে পূজো সাজিয়েছিলেন আমার কল্যাণ-কামনায়।

সেই পিসিমাকে সবিতা বুঝল না। শুধু বাইরের আচারটাই দেখল—ওঁর স্নেহের সেই অন্তঃশীলা দিকটা আবিষ্কার করতে পারল না। ক্রুদ্ধ অভিমানে আমি ভাবতে লাগলাম, সেই ভালো। সবিতা বাপের বাড়িতেই থাকুক। পিসিমার স্নেহচ্ছায়াতেই আমার দিনগুলো পরম শান্তিতে কেটে যাবে।

অফিস থেকে ফিরতে রাত হল। ইচ্ছে করেই রাত করেছিলাম। বহুক্ষণ চুপ করে বসে ছিলাম গড়ের মাঠে ঘাসের ওপর—কালো-আকাশ ছাওয়া একরাশ তারার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। সবিতাও যে এত সহজে ভুল বুঝবে তা কে জানত? পৃথিবীতে কোনো মেয়ের মনের কাছ থেকেই কি এতটুকু গভীরতার আশা করা যায় না?

বাড়ি ফিরে দেখলাম, পিসিমাও নেই। তিনি বেনারস এক্সপ্রেসে চলে গেছেন—চাকরটা তাঁকে তুলে দিয়ে এসেছে। বলেছেন, তোর কোনো ভয় নেই বাবা। তোর বাবুকে বলিস্, আমি স্টেশন থেকে টাঙ্গা নিয়ে ঠিক বাসায় চলে যাব।

আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার আরও মনে পড়ল, পিসিমাও কম অভিমানিনী নন। বিধবা হয়েও শ্বশুরবাড়িতে তাঁর মর্যাদার কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু ছোট দেবরের একটিমাত্র কথায় তিনি এক বস্ত্রে সে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলেন—আর ফিরে যান নি। তারা সাধাসাধি করেছিল অনেকবার।

অতএব আমার এখানেও তিনি আর ফিরবেন না। মরে গেলেও না।

তিনদিন পরে আমি সবিতার কাছে গেলাম।

—পিসিমা চলে গেছেন। এবারে তুমি ফিরে এসো নিজের ঘরে।

ইচ্ছে করলেই সবিতা তখন সব জিনিসকে সহজ করে দিতে পারত। কিন্তু আমার কথাটাকে যে কী ভাবে নিল, তা সে-ই জানে। তার চোখ দুটো দপ দপ করে জ্বলে উঠল।

তীক্ষ্ণ, ধারালো গলায় সবিতা বললে, তিনি থাকতে বুঝি ডেকে নিয়ে যাওয়ার সাহস ছিল না? ইন্‌ভার্টিব্রেট্।

আমি বলতে পারতাম, তুমি চলে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনিও চলে গেছেন। কাজেই সাহসের পরীক্ষা দেবার সময় পাইনি। কিন্তু ও-সব কিছুই বলা হল না। সবিতার ওই কুৎসিত গালটা যেন বিস্ফোরকের পল্‌তেয় আগুন ধরিয়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও বিদীর্ণ হয়ে গেলাম।

বললাম, আমি ইন্‌ভার্টিব্রেটই বটে। যাদের ভার্টিব্রা আছে, সে-সব উচ্চ শ্রেণীর প্রাণীদের সঙ্গে দেখছি আমার আর পোষাবে না। বেশ, আমি যাচ্ছি। নিজে থেকে কখনো ফিরে যাও যাবে, আমি সাধতে আসব না তোমাকে।

সবিতা দীপ্ত চোখে বললে, তোমার ঘরে যেচে ফিরে যাওয়ার প্রয়োজন আমার কোনোদিনই ঘটবে না। সামান্য লেখাপড়া আমি শিখেছি—নিজের পায়ে কেমন করে দাঁড়াতে হয়, তা আমি জানি।

হন্ হন্ করে আমি বেরিয়ে এলাম। ট্রামে উঠতে যাচ্ছি—এমন সময় শুনলাম পেছনে মুকুল ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকছেঃ প্রদ্যোত দা—শুনুন—শুনুন—

কিন্তু আমি আর শুনলাম না। তৎক্ষণাৎ চল্‌তি গাড়িটায় লাফিয়ে উঠে পড়লাম।

তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেল। মাসছয়েক কোনোমতে কাটল—আমার অনুতাপের পালা শুরু হয়ে গেল। আর চলে

না। এমন কি এবারে রাগ হতে লাগল পিসিমার ওপরেই। বেশ তো ছিলাম আমরা—মাঝখান থেকে তিনি এসে খামোখা একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়ে গেলেন।

কিন্তু সবিতার রাগ আর কিছুতেই পড়ে না। আমি বার কয়েক গেলাম, সে আমার সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করল না। শ্বশুর মশায় আমার পক্ষ নিলেন—বিস্তর গালমন্দ করলেন মেয়েকে। কিন্তু সবিতা প্রতিজ্ঞা করেছে, আমার মতো মেরুদণ্ডহীনের ঘর সে কিছুতেই করবে না।

শেষ পর্যন্ত মুকুল অবধি ক্ষেপে গেল। একদিন সোজা আমার কাছে এসে বললে, দিদি মুখপুড়ীর ভারী তেজ হয়েছে প্রদ্যোত দা। ওর শিক্ষা হওয়া দরকার। আপনি আবার বিয়ে করুন।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, তুমি এ-কথা বলছ মুকুল ?

এন্. সি. সি.র ক্যাপ্টেন স্পোর্টস্‌ম্যান মুকুল বললে, কেন বলব না ? দিদি যখন কিছুতেই ফিরে আসতে রাজী নয়, তখন আপনি কেন আর মিথ্যে কষ্ট করবেন ? বিয়ে করে ফেলুন—আমি আছি আপনার সাপোর্টার।

বলে মুকুল চলে গেল। এক দিক থেকে হয়তো কথাটা অন্যায় বলে নি—এভাবে মিথ্যে প্রতীক্ষা করবার কোনো অর্থ হয় না। এখন স্বচ্ছন্দেই আমাদের মধ্যে লিগ্যাল্ সেপারেশন হতে পারে। আমি নতুন করে শুরু করতে পারি—সবিতাও মুক্তি পায়।

কিন্তু মনের মধ্যে কিছুতেই সাড়া পেলাম না। ক্রমাগত অনুভব করতে লাগলাম এ আমার পৌরুষের অপমান, আমার মনুষ্যত্বের গ্লানি। নিজের শক্তি দিয়ে বিবাহিতা স্ত্রীকে আমি জয় করতে পারলাম না—শেষ পর্যন্ত তার একটি অন্ধ জেদের কাছেই আমার হার মানতে হল! এতবড় লজ্জা নিয়ে বন্ধুদের সামনে আমি কেমন করে মাথা তুলে দাঁড়াব!

আমি প্রদ্যোত লাহিড়ী—ছাত্র-জীবনে কোনো পরীক্ষায় ফেল করি নি। এম-এ, ল—সবগুলোই পাস করেছি কৃতিত্বের সঙ্গে। খেলার মাঠেও কিছু নাম ছিল এক সময়ে। আজকে যে চাকরি করি, যে কোনো শিক্ষিত বাঙালী ছেলের পক্ষেই তা লোভের বস্তু।

তা হলে কেন হার মানব সবিতার কাছে? এত সম্পদ থাকতেও কেন মুখ লুকিয়ে সরে আসব কাঙালের মতো? আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাকে দেখলাম। না, এখানেও আমি ঠকি নি। রূপবান কিনা জানি না: কিন্তু কোনো মেয়ে অন্ততঃ আমায় কুশ্রী কদাকার বলবে না। স্বাস্থ্যের দীপ্তিতে চোখ-মুখ আমার ঝলমল করছে। নার্সিসাস্ না হয়েও বলতে পারি—আমার চেহারার সঙ্গে যদি আমি প্রেমে পড়ে যাই, তা হলে কেউ সেটাকে গুরুতর অপরাধ বলে মনে করবে না।

এত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও সবিতা আমায় স্বীকৃতি দেবে না? অসম্ভব, এ কিছুতেই হতে পারে না। যেমন করে হোক—তাকে আমায় জয় করতে হবেই।

সবিতাকে টেলিফোনে ডেকে বললাম, তোমার সঙ্গে শেষবার খানিকটা আলোচনা করতে চাই।

—কোনো দরকার নেই। সব আলোচনা শেষ হয়ে গেছে।—এই বলে সবিতা কনেক্‌শন কেটে দিলে।

নিরুপায় ক্রোধে আমি রিসিভারটাকে আছড়ে ফেললাম। ইচ্ছে করতে লাগল, নিজের হাত দুটোকেই কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিই।

এমন সময় আবার মুকুল এসে হাজির।

—দিদি বিহারের কী একটা কলেজে চাকরি পেয়েছে। চলে যাচ্ছে আসছে মাসেই। ডিভোর্সের কাজটা এখুনি সেরে নিন প্রদ্যোতদা।

বললাম, না। এত সহজেই আমার অধিকার আমি ছাড়তে পারব না। তা ছাড়া এমনি একটা কেস নিয়ে কোর্টে গিয়ে দাঁড়ানোর চাইতে আত্মহত্যা করা অনেক বেশি সম্মানের হবে প্রদ্যোত লাহিড়ীর পক্ষে।

মুকুল চিন্তিত হয়ে বললে, তাই তো। তা হলে ?—তার পরেই ওর মুখ-চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। একুশ বছরের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটা রোম্যান্টিক কল্পনা চাড়া দিয়ে উঠল ওর মাথায়।

—একটা উপায় আছে প্রদ্যোতদা। শেষ অস্ত্র আপনার।

—কী উপায় ?

—জেলাসি।

—মানে ?

—আর একটি মেয়ের সঙ্গে খুব ঘটা করে মিশতে আরম্ভ করুন। দিদি কখন কোথায় যায়—সব খবর আমি সাপ্লাই করব। আপনি এমন ব্যবস্থা করবেন—যাতে ব্যাপারটা ওর ভালো করে চোখে পড়ে। তারপরে আমার ম্যানিপুলেশন তো আছেই। দেখুন না একবার চেষ্টা করে।

এত দুঃখের মধ্যেও আমার হাসি পেল।

—কী পাগলামি করছ মুকুল। জীবনটা নাটক নয়।

—কে বললে প্রদ্যোতদা ? জীবন নিয়েই তো নাটক। কখনো কখনো নাটকের সুরটা জীবনের চাইতে খানিক চড়া পর্দায় তুলে দিতে হয়—এইটুকুই যা তফাত।

আমি বললাম, না—না, সে হয় না।

মুকুল ক্ষুণ্ণ হয়ে চলে গেল।

ওকে আমল দিলাম না বটে, কিন্তু কথাটা মাথা থেকে একেবারে মুছে গেল না। অলস কল্পনার মতো গুঞ্জন করতে লাগল সারা সকাল। তারপর অফিসে এসে নতুন টাইপিস্টকে

যখন জরুরি একটা চিঠি ডিক্‌টেট্‌ করছি, তখন মুকুলের আইডিয়াটা আবার বিদ্যুৎ-চমকের মতো ফিরে এল।

নতুন টাইপিস্টটি পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা মেয়ে। ম্যাট্রিক পাস। সামান্য শর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটিং জানে। আমার এক বন্ধু ওকে আমার কাছে এনে দিয়েছিল। অনেক মিনতি করে বলেছিল, চাকরিটা একে করে দাও ভাই—একটা বিপন্ন সংসার রক্ষা পাবে।

শীর্ণ, শ্যামবর্ণা একটি মেয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল প্রার্থনার ভঙ্গিতে। গভীর কালো দুটি চোখের তারা—হঠাৎ দেখলে মনে হয় জলে টল টল করছে। আমার ভারি করুণা হয়েছিল। বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করি নি—চাকরি দিয়েছিলাম।

মেয়েটির নাম মায়া।

আজ যখন আমার সামনে বসে এই প্রায়-কিশোরী, ভীরু শ্যামবর্ণা মেয়েটি ডিক্টেশন নিচ্ছিল, তখন আচমকা খেয়ালে আমার মনে হল, একে কাজে লাগালে কেমন হয়? এর জন্যে অনেক কিছুই তো আমি করেছি, প্রতিদানে এর কাছ থেকে এটুকুও কি আশা করতে পারি না?

বললাম, ছুটির পরে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে যেয়ো মায়া। কথা আছে।

মায়া একবার সভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল। হয়তো ভাবল—কোথায় কী অপরাধ করে ফেলেছে, ওর চাকরি নিয়ে টানাটানি পড়বে।

বিকেলে আমি সব খুলে বললাম ওকে অকুণ্ঠভাবেই। আমার স্ত্রীর কথা, তার সঙ্গে আমার মনোমালিন্যের কথা। শান্ত গভীর চোখ মেলে সব শুনে যেতে লাগল, কোনো জবাব দিলে না।

তারপরে আমার প্ল্যান ওকে খুলে বলতেই ও চমকে উঠল। মুখ থেকে রক্ত সরে গেল মুহূর্তে।

—না না, সে আমি পারব না।

—কেন পারবে না? এ তো অভিনয় ছাড়া কিছু নয়! এর মধ্যে তো কোনো সত্যি নেই?

—মাপ করবেন, আমি—

আমি ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, বেশ, তা হলে থাক্। তুমি যদি রাজী না থাক আমি তো তোমার ওপরে জোর করতে পারি না! তবে এক সময়ে আমি তোমার কিছু উপকার করেছি, তাই ভেবেছিলাম—

মায়া কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল নিঃশব্দে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, আচ্ছা, আপনি যা চান—তাই হবে।

আর, ওদিকে মুকুল লাফিয়ে উঠল।

—ঠিক আছে প্রদ্যোতদা, আর ভাবনা নেই। কাল শনিবার তো? আপনি অফিসের পর আপনার টাইপিস্টকে নিয়ে বটানিক্‌সে বেড়াতে চলে যান। আমি ওদিকে দিদিকে ম্যানেজ করে ফেলছি।

পরামর্শ ঠিক হয়ে গেল। মায়াকে নিয়ে কোথায় কী ভাবে আমি বসব—দূর থেকে জিনিসটা কতখানি রোমান্টিক দেখাবে সে সম্পর্কে আমরা পুরোপুরি প্ল্যান করে ফেললাম। একেবারে নিখুঁত স্টেজ-ক্র্যাফ্‌টের ব্যাপার।

যথাসময়ে পরের দিন আমি মায়াকে নিয়ে বটানিক্‌সে চলে গেলাম।

বসলাম গিয়ে ভাঙা জেটিটার ওপর—যেখানে সচরাচর কেউ বসে না। বসলাম মায়ার গা ঘেঁষেই। সামনে রৌদ্র-ঝলমল গঙ্গা, মাথার ওপরে গাছের ছায়া কাঁপছে, পাখি ডাকছে একটানা। মায়া পাথরের মত শক্ত আর আড়ষ্ট হয়ে রইল।

কী বলব—কী বলা উচিত ভেবে পেলাম না। একবারের

জন্যে চোখে পড়ল মায়ার শাড়ীটা ভারি খেলো, ওর পায়ের জুতোজোড়া জীর্ণ আর বিবর্ণ। পায়ে ছেঁড়া জুতো দেখলে আমার কেমন বিশ্রী লাগে। মনে হয় এর চাইতে দারিদ্র্যের দীনতা আর কোথাও নেই—মেয়েদের ক্ষেত্রে তো নেই-ই।

চুপ করেই বসেছিলাম আমরা—হঠাৎ পেছনে মুকুলের উচ্ছ্বসিত গলা ভেসে এল : দিদি, ছাখ্ ছাখ্—সামনে গঙ্গাটাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে!

কোড্-সিগন্যাল্! সঙ্গে সঙ্গে মায়ার একখানা ঠাণ্ডা শীর্ণ হাত আমি মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলাম। থর থর করে কেঁপে উঠল মায়া—একটু হলেই গঙ্গার জলে পড়ে যেত।

মুখ না ফিরিয়েও শুনতে পেলাম, আমাদের পেছন দিয়ে দু-জোড়া জুতোর শব্দ এগিয়ে চলে গেল। একটা নতুন কম্বিনেশন শু—ওটা মুকুলের; আর একটা মেয়েদের চটির আওয়াজ—একটু বেশি চঞ্চল আর দ্রুত। যেন অতিরিক্ত তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেল জায়গাটা।

আর আমি তৎক্ষণাৎ মায়ার হাতটা ছেড়ে দিলাম। মড়ার হাতের মতো সেটা ধপ করে পড়ে গেল।

আরো মিনিট তিনেক বসবার পরে আমি বললাম, চল।

মায়া নড়ল না। তেমনি পাথর হয়ে বসে রইল।

আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, শুনতে পাচ্ছ না? চল, যাওয়া যাক। আজকের মতো কাজ মিটে গেছে।

মায়া নিঃশব্দে একটা ছায়ার মতো উঠে দাঁড়াল।

ফেরার পথে আমরা একটা কথাও বললাম না। ট্যাক্সির পেছনের সীটে মায়াকে বসিয়ে আমি বসলাম ড্রাইভারের পাশে। সমস্ত মনটা বিস্বাদ হয়ে ছিল। নিজের নির্লজ্জ অভিনয়টা যেন আমাকে চাবুক মারতে লাগল এখন। ছিঃ-ছিঃ, কী ভাবল যে

সবিতা! অন্তত আমার চরিত্রের এই দিকটা সম্পর্কে তো ওর কিছুটা শ্রদ্ধা এতদিন ছিল।

মায়াকে আমি বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারতাম, কিন্তু কোনো উৎসাহ ছিল না। এস্‌প্ল্যানেডের মোড়েই ওকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলাম।

সন্ধ্যায় আলো নিবিয়ে চুপ করে ঘরে বসে ছিলাম। কেমন একটা আত্মগ্লানির পালা এসেছে—তীক্ষ্ণ অনুতাপে জর্জরিত হচ্চে মন। নিজের হাতটাকে অদ্ভুত রকমের ক্লেদাক্ত বলে বোধ হচ্ছে। সবিতার ঘৃণাভরা চোখ দুটো যেন স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিলাম। শেষকালে অফিসের একটা টাইপিস্ট—আর ওই তার চেহারা! ছিঃ, আমার সম্পর্কে কী যে ভাবল সবিতা!

জুতোর শব্দে সিঁড়ি কাঁপিয়ে সোল্লাসে মুকুল এসে ঘরে ঢুকল।

—আরে, মন খারাপ করে অন্ধকারে বসে আছেন কেন প্রদ্যোতদা? গুড নিউজ। ওদিকে ওষুধ ধরেছে।

সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনায় আমি চঞ্চল হয়ে উঠলামঃ তাই নাকি?

—আমার প্ল্যান প্রদ্যোতদা—সিয়োর সাকসেস্‌। বাড়িতে ফিরেই দিদি 'মাথা ধরেছে' বলে সটান নিজের ঘরে গিয়ে লম্বা হল। আমি গিয়ে আরো ভালো করে তাতিয়ে দিলাম। বললাম, প্রদ্যোতদার দোষ কী? সে ভদ্রলোক আর কতদিন হাঁ করে বসে থাকবে তোমার আশায়? শুনছি, অফিসের ওই মেয়েটিকেই বিয়ে করবে কিছুদিনের মধ্যে। শুনে দিদি চিৎকার করে বললে, 'তুই বেরো আমার সামনে থেকে'।—মুকুল উচ্ছ্বসিত হয়ে হাসতে লাগলঃ তুমি বিয়ে করবে এ-কথা এমনি শুনলে দিদি হয়তো এতটা মুষড়ে পড়ত না। কিন্তু প্র্যাক্‌টিক্যাল ডেমোনস্ট্রেশন একেবারে আলাদা জিনিস। দিদির ইন্‌স্‌টিংকটে মোক্ষম ঘা লেগেছে। আর দু-চারদিন

চালিয়ে যান প্রদ্যোতদা—দেখবেন দিদি নিজেই তার সম্পত্তি উদ্ধার করতে ছুটে আসছে।

টু মেক এ লং স্টোরি শর্ট সুকুমার—এর পর থেকে আশ্চর্য যোগাযোগে প্রায়ই সে-সব জায়গায় সবিতা আর মুকুলের আবির্ভাব ঘটতে লাগল—যেখানে আমি আর মায়া নিরিবিলিতে পাশাপাশি বসে আছি, কিংবা কোনো রেস্তোরাঁয় চা খাচ্ছি। একদিন তো নিউ মার্কেট থেকে একটা শাড়ীই কিনে দিলাম মায়াকে। বুঝতে পারছিলাম এ-অভিনয়ে মায়ার কষ্ট হচ্ছে—কিছু সান্ত্বনা তো ওকে অন্তত দেওয়া দরকার!

আর শাড়ীটা যখন ওকে কিনে দিচ্ছি, ঠিক তখনই পাশ দিয়ে সবিতা চলে গেল। দেখেও দেখল না।

মুকুল এসে খবর দিলে, কাল সারারাত দিদি ঘুমোয় নি—খালি কেঁদেছে। সকালে দেখলাম, ওর চোখ দুটো টকটকে লাল।

—আর কত দেরি মুকুল?

—দেরি নেই প্রদ্যোতদা, প্রায় রেডি হয়ে এসেছে সব। আজ বিহারের সেই কলেজটা থেকে দিদির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এসেছিল। দিদি সেটাকে ছিঁড়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিয়েছে। চালিয়ে যান প্রদ্যোতদা।

—কিন্তু অফিসে যে আমাকে আর মায়াকে নিয়ে কথা উঠেছে হে।

—উঠুক না—উঠতে দিন। এগুলো সবই বরং আপনার ফেভারে যাচ্ছে। দিদি একবার ফিরে এলে আর ভাবনা কিসের? আর কুৎসা? মানুষ ওটাকে যত তাড়াতাড়ি ফেনিয়ে তোলে, তত তাড়াতাড়ি ভুলেও যায়। আপনি ঘাবড়াবেন না। চিয়ারিও!

সেদিন অফিসে বিবর্ণ নীরক্ত মুখে মায়া আমার ঘরে এসে ঢুকল। সামনে একটা কার্ড রেখে বললে: এটা আমার টেবিলের ওপর ছিল।

পড়ে দেখলাম তাতে বড় বড় হরফে লেখা আছে: কনগ্র্যাচুলেশনস্ টু মিসেস মায়া লাহিড়ী।

ওর দিকে তাকিয়ে আবার সহানুভূতিতে আমার মন ভরে গেল। বললাম: কিছু মনে কোরো না মায়া। আর বেশিদিন তোমায় কষ্ট পেতে হবে না। শুধু একটা কথা বলে রাখি। আমার জন্যে যা তুমি করলে, তার দাম দেব না—এত বড় অকৃতজ্ঞ আমি নই। কিছুদিনের মধ্যেই একটা মোটা ইনক্রিমেণ্ট হবে তোমার। আর তোমার সেই আই-এ-ফেল বেকার ভাইটারও একটা ব্যবস্থা প্রায় করে এনেছি—আসছে মাসেই তার চাকরি হবে।

মায়া উচ্ছ্বসিত হল না—একটা কথাও বললে না। কেবল ছুটো জলভরা কালো চোখের দৃষ্টি আমার মুখের ওপরে একবার ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

নাটকের ক্লাইম্যাক্স ঘটল তিন দিন পরে। সিনেমায়।

প্রেমের গল্প। আমার ছু-একবার মনে হল যেন পাশে মায়া বার বার চঞ্চল হয়ে উঠছে—ওর চাপা দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে থেকে থেকে। কিন্তু সেদিকে আমার লক্ষ্য ছিল না। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম, মাত্র ছুটো রো পেছনেই বসে আছে সবিতা—ওর চোখ যতখানি পর্দায়, তার চাইতেও বেশি করে পড়ে আছে আমাদের ছুজনের ওপরে। আর সে চোখে ছুরির ধার।

ইনটারভ্যালের আলো জ্বলল।

দেখি, কেমন এলিয়ে বসে আছে মায়া। এয়ার-কনডিশনড্ হলে আমার শীত-শীত করছিল, কিন্তু মায়ার কপালে কয়েক ফোঁটা ঘাম চিক্ চিক্ করে উঠছে।

আর তক্ষুণি এগিয়ে এল মুকুল। হাসির ছটায় উদ্ভাসিত চোখ।

—একবার বাইরে আসুন প্রদ্যোতদা। লবীতে দিদি আপনাকে ডাকছে।

আমি বুঝলাম। প্রায় লাফিয়ে উঠলাম সীট্ থেকে। মায়ার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললাম, আমি চলে যাচ্ছি। আর ফিরব না, তুমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে যেয়ো।

মায়া আশ্চর্য দৃষ্টি মেলে আমার দিকে চেয়ে রইল। যেন স্বপ্নের মধ্যে ডুবে আছে—আমার কথাটা সম্পূর্ণ শুনতে পাচ্ছে না, বিশ্বাসও করতে পারছে না। কিংবা এই মুহূর্তে ও আমাকে চিনতেই পারছে না ভালো করে।

আমার দাঁড়াবার সময় ছিল না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম।

সবিতা অপেক্ষা করছিল লবীতে। মুখটা টকটকে লাল—দু চোখে আগুন জ্বলছে।

বিনা ভূমিকাতেই বললে, কী ভেবেছ তুমি? এত শিক্ষা, এত কাল্চার সত্ত্বেও শেষকালে ওই টাইপিস্টের সঙ্গে—?

বললাম, কী করব বল? তুমি যখন ফিরবেই না, তখন বাধ্য হয়েই—

লবীর মধ্যে দাঁড়িয়ে যতটা চিৎকার করা সম্ভব, সবিতা তাই করলে। বললেঃ কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। এখুনি ট্যাক্সি নিয়ে বাড়ি ফিরে চল। তুমি কি ভেবেছ আমি বেঁচে থাকতে ওই মেয়েটা আমার ঘরে গিয়ে ঢুকবে? তার আগে—

আমি সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সি ডাকলাম। দেড় বছর পরে ফিরে এলাম সবিতাকে নিয়ে। দেড় বছর পরে আমার পৌরুষের শক্তির কাছে হার মানল সবিতা। নাউ—উই আর হ্যাপিলি রি-ইউনাইটেড্।

প্রদ্যোত হাসল।

লাঞ্চের সময় শেষ হয়ে গেছে। অফিসে ফিরে আসছে কেরানীর দল। আমিও ওঠবার উপক্রম করলাম।

প্রদ্যোত বললে : আজ সন্ধ্যায় গ্রেট ইস্টার্নে মুকুলকে একটা ভালো ডিনার দিতে হবে। মায়াকেও আসতে বলেছি। তুমিও এসো না সুকুমার ? চমৎকার হবে।

আমি বললাম, মন্দ কী! প্রীতিভোজের এর চাইতে ভালো উপলক্ষ আর কী হতে পারে ?

ঠিক সেই সময়ে একটা বেয়ারা এসে ঘরে ঢুকল। একটা ব্রাউন পেপারের প্যাকেট, একখানা পাঁচ টাকার নোট আর একটা দরখাস্ত প্রদ্যোতের সামনে রেখে বললে : মিস্ রায় এগুলো আপনাকে দিতে বলে চলে গেলেন।

—মিস্ রায়! মায়া! দরখাস্তের ওপর চোখ বুলিয়ে প্রদ্যোত বললে : হোয়াট্! রিজাইন্ দিয়েছে!

আমি বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছিলাম—দাঁড়িয়ে পড়লাম।

দাঁতে দাঁতে চেপে প্রদ্যোত বললে : লুক সুকুমার—হোয়াট্ এ ফুল! চাকরি ছেড়ে দিলে! খাবে কী ? তুদিন পরে ইন্‌ক্রিমেণ্ট হত—ওর ভাইটার একটা ব্যবস্থা করেও এনেছিলাম। সব ছেড়ে দিয়ে চলে গেল ? ইডিয়ট! আর এই প্যাকেটটাই বা কিসের ? টাকাই বা কেন ?

আমি কিন্তু প্যাকেটটা দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। ওর ভেতরে একটা শাড়ি আছে—ওপরে নিউ মার্কেটের দোকানের ছাপ। আর ওই পাঁচটা টাকা বোধ হয় সেই ট্যাক্সি ভাড়া—সিনেমা থেকে বেরিয়ে আসবার সময় যে নোটটা প্রদ্যোত মায়ার হাতে গুঁজে দিয়েছিল।

গোত্র

বৃষ্টিটা অত্যন্ত বেয়াড়াভাবে নেমে এল। আকাশের হালকা হালকা মেঘগুলো সারা সকাল ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ প্রায় বিনা নোটিশেই তারা জুড়ে এল একসঙ্গে। কোথা থেকে একটা ঠাণ্ডা দমকা হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল পথের ওপর, এক টুকরো কাগজ ঘুরপাক খেয়ে খেয়ে অনেক দূরে উড়ে চলে গেল, চোখে-মুখে ধুলো ছড়িয়ে পড়ল একরাশ, তারপরে নেমে এল রাশি রাশি শ্বেতকরবীর মতো বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা।

বিশৃঙ্খল শাড়িটাকে সামলাতে সামলাতে সন্ধ্যা উদ্‌ভ্রান্ত চোখে তাকাল। সব চাইতে কাছের গাড়ি-বারান্দাটাও প্রায় দু শো গজ দূরে। ওখানে পৌঁছুবার আগেই জামা-কাপড়ের কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে না। পাশেই মিঠাইয়ের দোকান থেকে হাতখানেক টিনের ঝাঁপ ফুটপাথের দিকে এগিয়ে এসেছে। আপাততঃ ওখানেই আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই আর।

আকাশ-ছেঁড়া খানিকটা চোখ-ঝলসানো বিদ্যুৎ, গরগরে মেঘের গর্জন—বৃষ্টি আরও চেপে এল। মিঠাইওলার কাচের বাক্সটায় প্রায় পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল সন্ধ্যা। টিনের ঝাঁপ থেকে ঝরঝরিয়ে জল পড়ছে সামনে। জলকাদার ছিটে এসে জুতো আর শাড়ির পায়ের দিকটা ভিজিয়ে একাকার করে দিচ্ছে। এলোমেলো হাওয়ায় বৃষ্টির দু-একটা ছাট চোখে-মুখে এসেও আছড়ে পড়ছে। তবু যেটুকু আত্মরক্ষা করা যায় এর মধ্যেই। ক্লান্ত বিমর্ষ দৃষ্টিতে সন্ধ্যা আকাশের দিকে তাকাল।

আরও মেঘ—আরও মেঘ। আরও কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে চারদিকে। তার মানে, বৃষ্টি এখন আর সহজে থামছে না। স্কুলে লেট অনিবার্য!

নিরুপায় ভাবে একবার ঠোঁট কামড়াল সন্ধ্যা। চাকরিটা এমনিতেই টলমল করছে—এবারে যাবে। প্রায়ই শোনা যাচ্ছে, অন্ততঃ স্কুল-ফাইন্যাল পাস না হলে কোন টীচারকেই আর রাখা হবে না। প্রাইমারি ক্লাসেও না। আণ্ডার-ম্যাট্রিক সন্ধ্যা। তারই মাথার ওপর খাঁড়াটা সব সময়েই ঝুলছে। এভাবে লেট হতে থাকলে সেটা নেমে আসতে খুব বেশি সময় লাগবে না।

ছাতা একটা ছিল—খোয়া গেছে দিনকয়েক আগে। নতুন মাসের মাইনে হাতে-না-আসা পর্যন্ত আর একটা কেনা সম্ভব নয়। বৃষ্টির রেণু জড়ানো ঘোলাটে চশমার মধ্য দিয়ে সন্ধ্যা দেখতে লাগল, দূরে খরধার বর্ষণের ভেতর ট্রামের ছায়ামূর্তি বেরিয়ে যাচ্ছে একটার পর একটা। কিন্তু কোন উপায় নেই। ট্রাম-স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে নির্ঘাত অবগাহন স্নান করতে হবে তাকে।

দমকা হাওয়ায় আবার ছাট এল এক পশলা। কাচের বাক্সটার গায়ে শরীরকে যথাসাধ্য এলিয়ে দিয়ে সন্ধ্যা আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগল। জুতোটা ভিজে জবজব করছে। শাড়ির পাড় কালো কাদার ছিটেয় একাকার।

মনের মধ্যে একরাশ ভাবনা। আশঙ্কা-মাখানো, অপ্রীতিকর। ভাবতে অসহ্য লাগে, না ভেবেও উপায় নেই। আড়াই হাত চওড়া গলির ভেতরে একতলার একখানা ঘর। দেওয়ালে উইয়ের রেখা। বড় ভাই সিনেমার গেট-কীপার—মাইনে কী পায় কে জানে, সংসারে দশ-পনের টাকার বেশি সাহায্য মেলে না তার হাত থেকে। ছোট ভাইটা কর্পোরেশনের স্কুলে ফ্রীতে পড়ে, কিন্তু কী যে পড়ে বলা শক্ত। মায়ের আরথ্রাইটিস। নিজের মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে। জীবন।

জীবন। আকাশ-ভাঙা একটানা বৃষ্টি। ট্রামের ছায়ামূর্তিগুলো

আরও আবছায়া। জলে কাদায় পায়ের জুতোটার অস্তিত্ব প্রায় লোপ পেতে বসেছে।

—চলুন না, ট্রাম পর্যন্ত এগিয়ে দিই।

সন্ধ্যা চমকে উঠল। সেই ছোকরা। হ্যাঁ, সেইটেই।

তাদের গলির মোড়ে চায়ের দোকানটায় রাতদিন বসে থাকে। বিড়ি টানে অনর্গল। পথ-চলতি মেয়েদের চোখ দিয়ে গিলে খাওয়া ছাড়া আর কোন কাজকর্ম নেই ওর। সিনেমার প্রত্যেকটা গানই জানা। তার চাইতেও ভাল করে জানা কোন্‌টা কখন লাগসই হবে। আগে নাকি মেয়েদের একেবারে গায়ের ওপরেই এসে পড়ত, মাঝখানে একবার পুলিসে ধরে নিয়ে যাওয়াতে সেটা বন্ধ হয়েছে।

পানের রসে রাঙানো কতকগুলো বীভৎস দাঁত বের করে ছোকরাটা হাসল ঃ আমার ছাতা আছে।

সন্ধ্যার ইচ্ছে করল, প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দেয় ছেলেটার গালে। কিন্তু এইখানেই তো শেষ নয়। এর পরে রাত আছে, আর আছে আধো-অন্ধকার প্রায় নির্জন গলি। টুইশন সেরে সে গলি দিয়ে বাড়ি ফিরতে প্রায়ই তার নটা সাড়ে নটা বাজে।

দু চোখে বিদ্যুৎ জ্বেলে সন্ধ্যা মুহূর্তের জন্যে ছোকরার বিগলিত মুখের দিকে তাকাল। তারপর কঠিন গলায় বললে ঃ দরকার নেই।

আবার নির্লজ্জ অনুরোধ শোনা গেল ঃ আপনার স্কুলের দেরি হয়ে যাবে যে! চলুন না।

প্রায় চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল সন্ধ্যার। দাঁতে দাঁত চেপে বললে ঃ তুমি এখান থেকে যাবে—না, লোক ডাকব আমি?

একটা চোখ ট্যারা করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে হাসল ছেলেটা। ছাতা খুলে এগিয়ে গেল বৃষ্টির মধ্যে। তারপর জলের আওয়াজ ছাপিয়েও

শিস্ টানার একটা তীব্র স্পষ্ট শব্দ ভেসে এল সন্ধ্যার কানে। পায়ের এক পাটি জুতো খুলে ওর দিকে ছুঁড়ে দেওয়ার উগ্র বাসনাটাকে প্রাণপণে দমন করল সন্ধ্যা।

বাড়ি ফিরতে বিকেল পাঁচটা। ক্ষিদে, ক্লান্তি আর বিষাক্ত অপমানে সারা মন জর্জরিত। লেট করে যাওয়ার জন্যে আজও হেড মিস্ট্রেসের কথা শুনতে হয়েছে।

—তোমার ছাতা হারিয়ে গেছে বলে তো আর সারা বছর স্কুলে রেনি-ডে দেওয়া সম্ভব নয়। যদি আসতে অসুবিধে হয়, ছুটি নাও।

ছুটি নাও। খুব ভদ্র ভাষাতেই কথাটা বলা হয়েছে, সন্দেহ কী! একেবারে পাকাপাকি ছুটির বন্দোবস্ত। এম. এ., এম. এড. হেড মিস্ট্রেস মার্জিত রুচির আড়ালটুকু বজায় রেখেছেন, কিন্তু তীর গিয়ে বিঁধেছে যথাস্থানে। বিষ-মাখানো তীর।

ভিজে জুতোর মধ্যে ক্লেদাক্ত পা দুটো টানতে টানতে ফিরছিল সন্ধ্যা। গলির মোড়ের চায়ের দোকান থেকে দ্রুত কণ্ঠের গান জেগে উঠল ঃ হাওয়ামে উড়্তা যায়ে, লাল দো-পাট্টা মল্মল্—

সেই ছোকরাই। এক ভাঁড় চা হাতে, আর এক হাতে জ্বলন্ত বিড়ি। দোকানের আলোতে দেখা গেল, একটা চোখ ট্যারা করে তাকিয়ে আছে কুৎসিত দৃষ্টিতে, মুখে সেই বীভৎস ভঙ্গি।

সন্ধ্যা পা চালাল তাড়াতাড়ি। একটা অশ্রাব্য হাসির আওয়াজ যেন তাড়া করে এল পেছন থেকে।

বাড়িতে ঢুকতেই চোখ পড়ল, বড়দা বিজয় কাবলী চটিতে পা গলিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করছে।

—দাদা!

সিঁড়িতে এক ধাপ নেমেছিল বিজয়, বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরাল।

—বেরিয়ে যাচ্ছি, পেছু ডাকলি কেন?

—একটা জরুরী কথা আছে।

বিজয় ভ্রূ কোঁচকাল, সস্তা হাতঘড়িটার দিকে তাকাল একবার : আমার টাইম হয়ে গেছে, পরে শুনব।

—দু মিনিট দেরি হলে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। কথাটা সত্যিই খুব দরকারী।

সন্ধ্যার রুষ্ট উত্তেজিত গলার স্বরে আশ্চর্য হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল বিজয়। অপ্রসন্ন মুখে বললে : কী হয়েছে ?

গলির মোড়ের ওই ছোকরাটার জ্বালায় তো রাস্তায় আর হাঁটা যায় না। একটা ব্যবস্থা কর।

—বুঝতে পেরেছি—সুখেন।—বিজয় চিন্তিত হয়ে ঘাড় নাড়ল : পয়লা নম্বরের গুণ্ডা।

—গুণ্ডা তো কী হয়েছে ? ধরে শায়েস্তা করে দাও।

—হ্যাঁ, সায়েস্তা করাই উচিত।—বিজয় আবার মাথা নাড়ল : তবে কি জানিস, ও তো আর একা নয়। দস্তুরমতো দলবল আছে, বলতে গেলে পাড়ার মালিক ওরাই। দেখলি নে, পুলিসে নিয়ে গিয়েও ওকে হজম করতে পারল না ? আমরা পাড়ায় নতুন ভাড়াটে, আমাদের কে দেখবার আছে, বল্ ? তা ছাড়া সন্ধ্যেবেলা যদি গলির ভেতরে ঘ্যাচাং করে ছুরিটা বসিয়ে দেয়, তা হলেই বা ওকে আটকাচ্ছে কে ?

—এর কোনও প্রতীকার নেই দাদা ?—ক্ষোভে অপমানে সন্ধ্যার মুখ-চোখ জ্বালা করতে লাগল : পথে বেরুলে যা-তা রিমার্ক করবে, যাচ্ছেতাই গান গাইবে, অপমান করবে, দেশে কি আইন নেই ?

—আইন ! হুঁ ! ওদের আইন ওদের হাতে।

—আমি পুলিস কমিশনারকে চিঠি লিখব।

—উল্টো ফল হবে তাতে।—বিজয় দার্শনিক ভঙ্গি করলে : একটা খোঁচা দেওয়া হবে কেউটে সাপকে। দুটোকে ধরে নিয়ে

যাবে, বাকিগুলো ছুরি শানাবে বসে বসে। মিথ্যে ওদের ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। আর তা ছাড়া—। বিজয় উদার ভাবে হাসতে চেষ্টা করলে: বললেই বা দুটো একটা কথা। গায়ে তো আর ফোসকা পড়ছে না! কান না দিলেই পারিস।

—দাদা!—তীব্র গলায় প্রায় চিৎকার করে উঠল সন্ধ্যা। কিন্তু বিজয় আর দাঁড়াল না। আমার টাইম হয়ে গেছে।—বলে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল, যেন পালিয়ে বাঁচল সন্ধ্যার সামনে থেকে।

—কাপুরুষ, মেরুদণ্ডহীন!—সন্ধ্যার চোখ ফেটে জল আসতে লাগল।

কিন্তু কাঁদবার সময় নেই। উনুন ধরিয়ে সাড়ে ছটার মধ্যে রান্না সেরে, অথর্ব মা আর ছোট ভাইটার খাবার ব্যবস্থা করে রেখে তাকে বেরিয়ে যেতে হবে। সাতটা থেকে সাড়ে আটটা—এই দেড় ঘণ্টা টিউশন। দুটি ছোট ছোট মেয়েকে পড়াতে হয়। মাসান্তে কুড়ি টাকা। আণ্ডার ম্যাট্রিকের পক্ষে লোভনীয়।

শুধু বেরুবার মুখে গলির মোড়ের সেই চায়ের দোকানটা। ফেরবার সময় আর একবার। অক্ষম অপমানে আর বিজয়ের ওপরে অসহ্য ঘৃণায় সন্ধ্যায় যেন নিশ্বাস আটকে আসতে চাইল। কয়লা ভাঙতে গিয়ে হাতুড়িটা বাঁ হাতের ওপর এসে পড়ল, একটা আঙুল ছেঁচে গেল—কিন্তু শরীরের যন্ত্রণা অনুভব করবার মতো মনের শক্তিও সে যেন খুঁজে পেল না।

মুখিয়েই ছিল সেই ছোকরা—সেই সুখেন। বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই অভ্যর্থনা কানে এল: গোরী গোরী বাঁকে ছোরী—

সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে পড়ল এক মুহূর্তের জন্য। এ পাড়ায় কি ভদ্র ছেলে একজনও নেই? এই খোলার চাল আর ভাঙা পুরনো বাড়ির রাস্তায় সাধারণ সভ্যতা-ভব্যতাও পথের ধারের ডাস্টবিনের জঞ্জালে

হারিয়ে গেছে? একবার ভাবল, এগিয়ে যায় সুখেনের সামনে, খুলে নেয় পায়ের জুতোটা, তারপর-

তারপর। ওরা নীচুতলার জীব—দু-এক ঘা জুতো খেলে ওদের অপমান হয় ন কিন্তু হারির লজ্জাটা সন্ধ্যা নিজেই কী করে? তা ছাড়া একটা কথা ঠিকই বলেছে বিজয়। রাতের পর রাত আছে—টিউশন সেরে এই পথ দিয়েই তাকে ফিরে আসতে হবে। তখন?

ছাত্রী দুটোকে পড়াতে বসেও সন্ধ্যা বার বার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল। রাত যত বাড়ছে, পথটার কথা ততই বিভীষিকার মত চেপে বসছে মনের ওপর। সাড়ে আটটা বাজতে না বাজতেই সে ছটফট করে উঠে দাঁড়াল।

বেরুবার মুখেই দেখা হল গৃহস্বামী হিরণ্ময়ের সঙ্গে। গাড়ী নিয়ে কোথায় চলেছে হিরণ্ময়।

—যাচ্ছেন মিস রায়?

—হ্যাঁ, আসি আজ।—শীর্ণ বিনয়ের হাসি হেসে সন্ধ্যা পা বাড়াল।

হিরণ্ময় বললে, আপনাদের ওই দিক দিয়েই তো আমিও যাব। চলুন না, পৌঁছে দিই।

সন্ধ্যা দ্বিধা করে বললে, কিন্তু—

হিরণ্ময় হেসে বললে, সঙ্কোচের কী আছে? চলুন না।

একটু ইতস্ততঃ করে সন্ধ্যা গাড়িতে উঠল।

দু-একটা ছাড়া কথা হল না রাস্তায়। আপনার ছাত্রীরা কেমন পড়ে? ভালোই। পাস করবে তো? নিশ্চয়ই। ভারি দুরন্ত কিন্তু। ও কিছু না—ছেলেবেলায় অমন হয়ই।

গাড়ি এসে গলির মোড়ে দাঁড়াল।

সন্ধ্যা বললে, গলিতে আপনার গাড়ি ঢুকবে না। আমি নেমে যাচ্ছি এখানেই। ধন্যবাদ, অনেক কষ্ট করলেন।

—কষ্টের কী আছে আর? পথেই তো পড়ল।—হিরণ্ময় হাসল: গলি দিয়ে কতটা যেতে হবে আপনাকে?

—খানিকটা।

—তবে চলুন, পৌঁছে দিয়ে আসি।—হিরণ্ময় নেমে পড়ল।

—না না, সে কি?

—চলুন না।—সুপুরুষ দীর্ঘদেহ হিরণ্ময় অন্তরঙ্গ গলায় বললে, একটুখানি তো রাস্তা। পৌঁছে দিচ্ছি। আপনার বাসাটাও দেখে আসব—যদি দরকার পড়ে কখনও।

—সে দেখবার মত নয় আপনার।—সংকোচে বিবর্ণ হয়ে গেল সন্ধ্যা।

—আপনি থাকতে পারেন, আমি দেখতে পারব না? চলুন না।

সন্ধ্যা আর বাধা দিলে না। আর একবার তাকিয়ে দেখল হিরণ্ময়ের সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ শরীরের দিকে। বিজয়ের মত ভীতু আর কোলকুঁজো নয়। শক্তি আর পৌরুষের প্রতীক।

দু পা এগিয়েই চায়ের দোকানটা। যথানিয়মে সুখেন বসে ছিল। কিন্তু আজ আর কোনও মন্তব্য শোনা গেল না—গানের আওয়াজও না। হিরণ্ময়ের ভারী জুতোর শব্দ সংকীর্ণ অপরিচ্ছন্ন গলির ভেতরে একটা অপরিচিত আভিজাত্যকে সরবে ঘোষণা করতে লাগল।

কৃতজ্ঞ চিত্তে সন্ধ্যা বলে ফেললে, এগিয়ে দিয়ে ভারি উপকার করলেন আমার।

—কেন বলুন তো?

—না, সে থাক্।—সন্ধ্যা কুণ্ঠিত হয়ে বললে, এমন কিছু না।

হিরণ্ময় কী বুঝল সে-ই জানে। হাসল।

দোর-গোড়ায় পৌঁছে সন্ধ্যা সসংকোচে বললে, ভেতর আসবেন না?

হিরণ্ময় ঘড়ির দিকে তাকাল: হবে আর একদিন, চলি আজ। নমস্কার।

—নমস্কার। অনেক কষ্ট করলেন—

—কিছু না—কিছু না।—পেছন ফিরল হিরণ্ময়। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে তাকাল দাঁড়িয়ে-থাকা সন্ধ্যার দিকে। হেসে একবার ঘাড় নাড়ল, তারপর ভারী জুতোয় অপরিচিত আভিজাত্যের আওয়াজ তুলে ম্লান গ্যাসের আলোয় মিলিয়ে গেল।

আর একবার হিরণ্ময়ের ওপর নিবিড় কৃতজ্ঞতায় সন্ধ্যার মন ভরে উঠল। ভাগ্যিস, বাড়িতে ঢুকতে চায় নি হিরণ্ময়! একতলার এই একখানা কদর্য ঘর—এক ফালি রান্নার বারান্দা। এর মধ্যে কোথায় বসতে দিত হিরণ্ময়কে—কী ভাবেই বা অভ্যর্থনা করতে তার?

চায়ের দোকানের প্রতিক্রিয়াটা টের পাওয়া গেল পরদিন স্কুলে বেরুবার সময়েই।

—আজকাল আবার সঙ্গে বডি-গার্ড ঘুরছে রে!

—সে গাড়ি করে আসে।

—বন্‌কি চিড়িয়া বন বন বোলো রে!

শুনতে পায় নি, এই ভাবেই এগিয়ে চলে গেল সন্ধ্যা।

আবার বৃষ্টি নামল পরদিন। নামল ছাত্রী পড়িয়ে বেরুবার মুখেই।

কাল তবু প্রায় চল্লিশ মিনিট পরে থেমেছিল, আজ সহজে থামবে বলে মনে হল না। কালো আকাশ থেকে বিলম্বিত লয়ের

বর্ষণ। করুণমুখে সন্ধ্যা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

ছাত্রীদের মা কোথায় নিমন্ত্রণে গেছেন, পাশের ড্রইং-রুমে সোফায় এলিয়ে কী যেন পড়ছিল হিরণ্ময়। হাওয়ায় দুটো ঘরের মাঝখানকার পর্দা উড়ছিল—হিরণ্ময়ের কালো চটি আর ডোরাকাটা পাজামার আভাস থেকে থেকে চোখে পড়ছিল সন্ধ্যার। হঠাৎ চটি আর পাজামা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে এল এদিকে, তারপর পর্দা সরিয়ে হিরণ্ময় ঢুকল।

—সাড়ে আটটা তো বেজে গেল মিস রায়। যাবেন কী করে?

—তাই তো ভাবছি।

জানলার মধ্য দিয়ে হিরণ্ময় একবার বাইরের আকাশে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলে: বেশ ঘটা করে নেমেছে। তাড়াতাড়ি তো ধরবে না।

শুকনো গলায় সন্ধ্যা বললে, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। আমি যাই। দু পা এগিয়েই ট্রাম পাব।

—তার দরকার কী?—হিরণ্ময় স্থির দৃষ্টিতে সন্ধ্যার দিকে তাকাল: আমি দিয়ে আসছি গাড়ি করে।

—রোজ রোজ—। সন্ধ্যার মুখে লালের ছোপ পড়ল: না না, সে থাক্।

সন্ধ্যার সেই রঙ-ধরা মুখের ওপর আর একবার চোখ বোলাল হিরণ্ময়। বললে, তাতে আর কী হয়েছে! আমার মেয়েদের পড়াতে এসে আটকে পড়েছেন আপনি—আপনাকে পৌঁছে দেওয়া আমার ডিউটি। একটু দাঁড়ান, তিন মিনিটের মধ্যেই আমি রেডি হয়ে নিচ্ছি।

অস্বস্তিভরে সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে রইল—মনের দিক থেকে ঠিক যেন

সায় পাচ্ছে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গলিটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। এমন বৃষ্টি—অস্পষ্ট গ্যাসের আলো, এমনি রাতে সম্পূর্ণ নির্জনতা। যদি সুযোগ বুঝে সুখেনের দল—

পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে উঠল সন্ধ্যার।

হিরণ্ময় কিন্তু তৈরি হয়ে এল তিন মিনিটের মধ্যে। শুধু একটা ওয়াটারপ্রুফ এনেছে কাঁধে করে। ধরিয়ে এসেছে একটা চুরুট, আর পায়ের চটিটাও বদলে নিয়েছে।

—চলুন।

সিঁড়ির গায়েই গাড়ি-বারান্দায় মোটর দাঁড়িয়ে ছিল। ভিজতে হল না।

সামনের কাচে ওয়াইপারের ডানা নড়তে লাগল, ছিপছিপে বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে চলল মোটর। দুজনেই চুপ। ড্রাইভারের আসনে হিরণ্ময়—পেছনের গদিতে সন্ধ্যা। দু পাশের ঝাপসা আলোগুলো মনের একরাশ অস্বচ্ছ ভাবনার মত ভেসে যেতে লাগল।

সেই গলির সামনে। গাড়ি থামল।

দরজা খুলে সন্ধ্যা বললে, নমস্কার, আমি আসি।

হিরণ্ময় ব্যস্ত হয়ে বললে, বিলক্ষণ! তা কি হয়? পৌঁছে দিয়ে আসছি।

হিরণ্ময় নামবার উদ্যোগ করলে। তারপরেই বললে, ছিঃ ছিঃ, ভারি ভুল হয়ে গেছে। ছাতা আনি নি—শুধু ওয়াটারপ্রুফটা—

—তাতে কী হয়েছে? আপনি গায়ে দিন না। আমি এমনিই যাচ্ছি। এটুকু পথ তো, কী আর অসুবিধে হবে?

—না না, তা হয় না।—হিরণ্ময় ব্যস্ত হয়ে উঠল : যা বৃষ্টি হচ্ছে! দু পা যেতেই ভিজে যাবেন। এটা আপনিই নিন।—চুরুট আর

পাউডারের একটা অদ্ভুত গন্ধ-মাখানো ভারী ওয়াটারপ্রুফটা হিরণ্ময় বাড়িয়ে দিল সন্ধ্যার দিকে।

বিপন্ন হয়ে সন্ধ্যা বললে, নিতেই হবে ?

—নিতেই হবে।—গাড়ির ভেতরে একটা ছোট আলো জ্বলছিল, সে আলোয় কেমন চকিত হয়ে উঠল হিরণ্ময়ের চোখ।

প্রকাণ্ড ভারী ওয়াটারপ্রুফটা গায়ে জড়িয়ে বিব্রতভাবে নামল সন্ধ্যা। সঙ্গে সঙ্গে হিরণ্ময়ও।

—ও কি, আপনিও নামলেন যে বৃষ্টির ভেতরে ?

—ঠিক আছে, চলুন।

কিন্তু চলতে গিয়েও সন্ধ্যা দাঁড়িয়ে পড়ল। করবী ফুলের মত বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে গ্যাসের আলোয় চকচক করা টুকরো টুকুরো জমাট জলের ওপরে। এই এক মিনিটের মধ্যেই হিরণ্ময়ের চুলগুলো ভিজে লেপটে গেছে, গালের ওপর দিয়ে যেন অশ্রুর ধারা ঝরছে।

হঠাৎ সন্ধ্যা বলে ফেলল, তা হলে আসুন, দুজনেই জড়িয়ে নিই এটা। বেশ বড় আছে—কুলিয়ে যাবে এখন।

বলেই সে মরমে মরে গেল—ভয়ে লজ্জায় সিঁটিয়ে গেল শরীর। কিন্তু হিরণ্ময় আর দেরি করলে না। হেসে বললে, তা মন্দ কথা নয়, এক কম্বলে অনেক ফকিরেরই জায়গা হয়।

সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ঘেঁষে এল সন্ধ্যার পাশে। একটা বলিষ্ঠ বাহু আর শরীরের স্পর্শ পেল সন্ধ্যা, আরও তীব্রভাবে পেল পোড়া চুরুট আর পাউডারের গন্ধ। তৎক্ষণাৎ ইচ্ছে করল, ছিটকে বেরিয়ে যায় এই ওয়াটারপ্রুফের মধ্য থেকে। কিন্তু শীতল মসৃণ এই আবরণটা যেন নাগপাশের মত তাকে বেঁধে ফেলেছে। সন্ধ্যা নিজেকে মুক্ত করতে পারল না।

হিরণ্ময়ের শরীরের স্পর্শকে, সেই বিরক্তিকর চুরুট আর

পাউডারের গন্ধকে যথাসাধ্য ভোলবার চেষ্টা করে যন্ত্রের মত পা ফেলতে লাগল সন্ধ্যা। এ পথটা যেন অনন্ত, আর প্রত্যেকটি পদক্ষেপ অসহ্য ভয় আর স্নায়ু-ছেঁড়া যন্ত্রণায় আকীর্ণ।

চায়ের দোকানটা কখন ফেলে এসেছে সন্ধ্যা জানে না। জানল তখন, যখন আকস্মিক ভাবে নাগপাশের শেষ মোচড়ের মত হিরণ্ময়ের একখানা পেশীকঠিন হাত তার কোমর জড়িয়ে ধরল।

—এ কি—এ কি করছেন আপনি!—অবরুদ্ধ গলায় যন্ত্রণার আকৃতি বেরিয়ে এল সন্ধ্যার।

দূরের গ্যাসটা বৃষ্টিতে প্রায় সাত হাত জলের নীচে তলাল। নির্জন গলি। তবু হিরণ্ময়ের চোখে বাঘের দৃষ্টি চিনতে ভুল হল না।

ফিস ফিস করে হিরণ্ময় বললে, শোনো, এমন রাত আর দুবার আসবে না।

হিরণ্ময়ের মুখটা নেমে আসছিল—সন্ধ্যার বাঁ হাতের চড়টা ঠিক গালে গিয়ে পড়ল তার। দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠল হিরণ্ময়ের, কী যেন বলতেও গেল কটু গলায়। কিন্তু তার আগেই গা থেকে ওয়াটারপ্রুফটা ফেলে দিয়ে সন্ধ্যা চেঁচিয়ে উঠল: ছাড়ুন—ছাড়ুন—বলছি—

—ইডিয়ট!—চাপা গলায় প্রায় গর্জন করে উঠল হিরণ্ময়।

আর—সন্ধ্যার চিৎকারেই আকৃষ্ট হয়ে তৎক্ষণাৎ পেছনে এসে দাঁড়াল সেই সুখেন: কী—কী হয়েছে?

নাগপাশের মত হাতটা চকিতে খুলে গেল হিরণ্ময়ের। সরে দাঁড়াল দু পা।

আবছা অন্ধকারে কুৎসিত মুখটা আরও কদাকার, আরও দানবীয়। তবু সেই মুখের দিকে তাকিয়েই শরণাগতের মত

আর্তগলায় সন্ধ্যা বললে, না ভাই, কিছু না। আমাকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দাও কেবল।

ভাই!—সুখেনের মুখের ওপর দিয়ে ঢেউয়ের মত কী দুলে গেল একবার। তার পর সুখেন বললে, চলুন দিদি। আমরা আছি পাড়ার লোক—গলির মোড়েই আছি, ভাবনা কী! হিরণ্ময়ের দিকে তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে সুখেন সন্ধ্যাকে বললে, বৃষ্টিতে ভিজছেন কেন—আসুন আমার ছাতার তলায়।

এবার সুখেনের ছাতার তলায় এগিয়ে আশ্রয় নিল সন্ধ্যা। এগিয়ে যেতে যেতে ঘাড় না ফিরিয়েই বললে, অনেক কষ্ট করলেন হিরণ্ময়বাবু। এবার যেতে পারেন আপনি। ধন্যবাদ—নমস্কার!

হিরণ্ময় কিন্তু তার পরেও প্রায় মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। আরও পরে, আধখানা শরীর ওয়াটারপ্রুফে ঢেকে, আধখানা ভিজতে ভিজতে একটা জন্তুর মত ফিরে চলল মোটরের দিকে। দামী মচমচে জুতোটায় জল কাদা থেকে ছপাৎ ছপাৎ করে একটা কুশ্রী পরাজিত আওয়াজ উঠতে লাগল।

পলায়ন

প্রভাত বললে, না, কিছুই ভাববার নেই। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

নিশ্চিন্ত হয়েই তো আছে মণিমালা। কাল রাত দশটার পর থেকেই। হাওড়া স্টেশনে শেষ ঘণ্টা। প্ল্যাটফর্মের উল্‌টো দিকটায় মুখ ফিরিয়ে বসে থাকা। হৃৎপিণ্ডে শেষ কয়েকটা মোচড়। গলার কাছে একটা আর্তনাদ এসে থমকে থাকা। তারপর বুকের শিরা বেয়ে কাঁপতে কাঁপতে সেটার নেমে যাওয়া। এঞ্জিনের আকস্মিক আকর্ষণে ঘুমন্ত কামরাটার যেন আচম্‌কা একটা হোঁচট খাওয়া। তারও পরে পাশের রেলিংগুলোর ওপর দিয়ে নড়ে যাওয়া ছায়ার সারি—খণ্ড-খণ্ড আলো আর অখণ্ড অন্ধকার।

আর অখণ্ড অন্ধকার। চলন্ত গাড়ি থেকে এক টুকরো কাগজ উড়িয়ে দেবার মতো করে কখন মণিমালা নিজের মনটাকেও উড়িয়ে দিয়েছে। আর সেই কাগজের ওপর এলোমেলো লেখার মতো ভাবনাগুলোকে ছুড়ে দিয়েছে বাইরে। সেই সঙ্গে পেছনের জীবনটাকেও। ভাবনার কিছুই নেই মণিমালার।

তবু ও-কথা কেন বলছে প্রভাত? নিজেকেই বলছে? নিজের ভাবনার শেষ নেই বলেই নির্ভাবনা হতে বলছে মণিমালাকে?

মণিমালার বয়স কম। আঠারো শেষ করে উনিশে পা দিতে এখনো এক মাস সাত দিন বাকী আছে তার। ঠিক এক মাস সাত দিন। যে দিন নতুন গুড়ের পায়েস রান্না হয়—ঠিক সাড়ে এগারোটা-বারোটা নাগাদ খেজুর রসের ঝাঁজালো গন্ধে ভরে যায় বাড়িটা। মণিমালার বয়স কম। গত বছর পর্যন্ত ওই গন্ধটা তার ভালো লেগেছিল, হয়তো এবারেও ভালো লাগত।

কিন্তু তার আগেই সে চলে এল প্রভাতের সঙ্গে। আর এক

আশ্চর্য গন্ধের আকর্ষণে। যে-গন্ধ ঘুম-ভাঙা রাতের তারার কাছ থেকে আসে, যে-গন্ধ এসে আছড়ে পড়ে গোধূলি-রাঙানো জানলার ওপরে, যে-গন্ধ আসে দূরের কথা-না-বোঝা গানের সুরের সঙ্গে। যে-গন্ধ রাত-দিন, দিন-রাত—জ্বরের মতো রক্তের ভেতরে থরো-থরো করে কাঁপে—সেই গন্ধের টানেই চলে এসেছে মণিমালা।

পাশাপাশি বাড়ি। প্রভাতের নিজের বাড়ি, মণিমালারা ভাড়াটে। প্রভাতের ঘর দোতলায় দক্ষিণমুখো, মণিমালাদের ঘর একতলায় উত্তরমুখো। কেবল চলবার গলি একটাই। সেই গলিতেই দেখা হত। মণিমালা কলেজ যাওয়ার পথে, প্রভাত অফিস যাওয়ার সময়।

জাত আলাদা—সংস্কার আলাদা। প্রভাতের বাবার চারখানা বাড়ি, মণিমালার বাবার ডি-এ শুদ্ধ দুশো বাইশ টাকা মাইনে।

কিন্তু একটাই গলি। একই বর্ষা নামে সে-গলিতে—একই বসন্তের হাওয়ায় এক মুঠো ধুলো ছড়িয়ে যায় তার ওপরে। কিছু দিন ধরে দু-পাশের দেওয়ালগুলোকে ভারি নিষ্ঠুর মনে হয়। তার পর হঠাৎ আবিষ্কার করা যায়, এই গলিটা গিয়ে বড় রাস্তায় শেষ হয়েছে। সেখানে জনারণ্য। অনেকখানি আকাশ, অনেক বড়ো পৃথিবী।

অনেক বড়ো পৃথিবী। হাওড়া স্টেশনের ছায়া-নড়া রেলিংগুলো কোথায় হারিয়ে গেছে। টুকরো-টুকরো আলোগুলো ভেসে গেছে স্রোতের প্রদীপের মতো। এখন অন্ধকার। যদিও বাইরে রাত শেষ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগেই—যদিও দু'ধারের পাহাড়গুলোর ওপর ধারালো রোদ ঝলকাচ্ছে এখন, তবু নিজের মনকে অন্ধকারে ডুবিয়ে নিথর হয়ে বসে আছে মণিমালা। যে-অন্ধকার সমাপ্তির। যে-অন্ধকার মৃত্যুর।

না, ভাববার আর কিছু নেই। সব ভাবনা এখন প্রভাতের। সে-ই ভাবুক।

ও-পাশের বার্থে মোটা ভদ্রলোকের এখনো ঘুম ভাঙে নি। বেলা সাড়ে-আটটা বেজে গেল—এখনো তাঁর নাক ডাকছে। তাঁর সেই নাকের ডাক শুনতে শুনতেই প্রভাত বললে, কোনো ভাবনা নেই। কিছুই করবেন না তোমার বাবা।

কী করতে পারেন বাবা? আরো তিনটি বোন—দুটি ভাই। সবাই মণিমালার ছোট। দুশো বাইশ টাকার চাকরির পরেও বাবাকে টিউশন করতে হয়। সময় কোথায় তাঁর থানা-পুলিসের হাঙ্গামা করবার?

শুধু প্রভাতের বাবা—

প্রকাণ্ড গোঁফ, প্রকাণ্ড চেহারা, প্রকাণ্ড মোটর তাঁর গলি জুড়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভয়ঙ্কর গম্ভীর গলায় কথা বলেন। যা কিছু করবার একাই করতে পারেন তিনি।

প্রভাত শুকনো হাসি হেসেছে।

—বাবার উইক্‌নেস্ আমি জানি। টন্‌টনে প্রেস্‌টিজ-জ্ঞান। কেউ এতটুকু আলোচনা করে—এও তিনি সইতে পারবেন না। দেখো না—সাত দিন যেতে না যেতেই কাগজে বেনামী বিজ্ঞাপন দেবেন: তোমরা দুজনেই ফিরে এসো। যা চাও তাই হবে।

মণিমালা বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করেই তো সব ভাবনা মুছে ফেলেছে মন থেকে। এখন যা কিছু ভাববার, প্রভাতই ভাবুক। কোন্ স্টেশনের টিকিট করা হয়েছে তা পর্যন্ত সে জানে না। জানবারও কৌতূহল নেই।

—সব ঠিক হয়ে যাবে, দেখো তুমি।

—আচ্ছা।

প্রভাত একটা সিগারেট ধরালো। কেমন কালো দেখাচ্ছে

ওর মুখটা। দাড়ি কামায় নি বলে? সারা রাত ঘুম হয় নি বলে? ত্রিযামার দীর্ঘ প্রহরগুলো দুশ্চিন্তার জাল বুনে কাটিয়েছে, সেই জন্যে? মণিমালা হঠাৎ লজ্জিত হল। ভোরের আলো মুখে এসে না পড়া পর্যন্ত সে তো কাটিয়ে দিয়েছে একটানা স্বপ্নহীন ঘুমের মধ্যে! প্রভাত কি তাকে স্বার্থপর ভাবছে? তারও কি উচিত ছিল, যখন প্রভাত একলা বসে একটার পর একটা সিগারেট টেনেছে, তখন জ্বালাধরা দুটো চোখ মেলে বাইরের শীতল রাত্রির দিকে তাকিয়ে থাকা? একটাও কথা না বলে প্রভাতের মনের ভার খানিকটা ভাগ করে নেওয়া?

ও-পাশের বার্থে মোটা ভদ্রলোকের নাক এখনো ডাকছে। একখানা বিশাল হাত ঝুলে রয়েছে পাশের কালো ট্রাঙ্কটার ওপরে। অদ্ভুত মোটা মোটা আর বেঁটে বেঁটে আঙুল, তাদের একটায় পলা-বসানো রূপোর আংটি। মণিমালা দেখতে লাগল। ওই রকম একটা আংটি যেন কার হাতে দেখেছিল সে—কিন্তু এখন তার নামটা কিছুতেই মনে আসছে না।

ট্রেনের বাঁশি বাজল। অনেকক্ষণ এক নাগাড়ে ছোটবার পরে এইবারে দম নেবে গাড়িটা। কোনো বড়ো স্টেশন আছে সামনে। লাল-শাদা এক রাশ বাড়ি। রূপালি গোল বার্মা-শেল। দুটো লরী। রেললাইন থেকে হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়া গোটাকয়েক শাখা। খটাং-খট্—খট্-খটাং—লাইন বদলের শব্দ। অনেকগুলো সিগন্যাল। প্ল্যাটফর্ম—স্টেশন—জনারণ্য—চঞ্চলতা। অনেক বড়ো পৃথিবী, আর অনেক মানুষ।

গাড়ি থামল।

অস্বস্তি ভরে প্রভাত বললে, দিনের বেলায় তো রিজার্ভেশন নেই—এখুনি লোক আসতে শুরু করবে।

আসুক না লোক—মণিমালার ভালোই লাগবে। আসুক,

গল্প করুক—মালপত্রে বোঝাই হয়ে যাক! এই ছোট কামরাটা যেন প্রভাতের মনের ভারে পীড়িত হয়ে আছে। চারদিকের পৃথিবী এসে দেখা দিক তার ভেতর, একটা কঠিন পাথরের মতো কী যেন পড়ে আছে এখানে—ভেঙে টুকরো-টুকরো করে দিক তাকে। যাকে পেছনে ফেলে এসেছে, তার বিলম্বিত কালো ছায়াটা অনেকের ভীড়ে হারিয়ে যাক। মণিমালা অনুভব করুক--নতুন জীবন, নতুন মানুষের ভেতর সে এখন সদ্যোজাত—নবজন্ম হয়েছে তার।

গাড়ির সামনে দিয়ে ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা, কুলির ছুটাছুটি—ট্রাঙ্ক—হোল্ড-অল স্যুটকেসের শোভাযাত্রা—কথা-কোলাহলের ঢেউ, আশে-পাশে দরজা খোলা, দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ। মণিমালা উৎসুক ভাবে গলা বাড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। দু'ধারের গাড়িতেই লোকের ওঠা-নামা, কিন্তু আশ্চর্য, এই কামরাটাকেই যেন সবাই এড়িয়ে চলেছে যথাসাধ্য।

নাক-ডাকানো মোটা ভদ্রলোক উঠে বসলেন। ঘুম-ভাঙা রাঙা চোখ মেলে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। শক্ত করে কাপড়ের কষি আঁটলেন কোমরে—সশব্দে হাই তুললেন একটা।

—কোথায় এলুম বলুন তো?—মণিমালার দিকে চোখ রেখে জড়ানো গলায় প্রশ্নটা বাড়িয়ে দিলেন প্রভাতের দিকে: কোন্ স্টেশন?

প্রভাত স্টেশনের নাম করলে।

—ওঃ, তবে তো পাক্কা পঁচিশ মিনিট দাঁড়াবে! চা খেয়ে আসা যাক।

বালিশের তলা থেকে একটা মিনের কাজ করা সিগারেট-কেস্ বের করে নিলেন। ভারী একজোড়া লাল জুতো পায়ে গলিয়ে

দুম্‌-দাম্‌ শব্দে নেমে গেলেন গাড়ি থেকে। যাওয়ার সময়ে আছড়ে বন্ধ করে গেলেন দরজাটা।

প্রভাতের কপালে ভ্রূকুটির রেখা ফুটে উঠল। মুখটা সত্যিই বড্ড কালো দেখাচ্ছে তার। দাড়ি কামায় নি বলে? সারা রাত ঘুমোতে পারে নি—সেই জন্যে?

প্রভাত বললে, চা খাবে?

—থাক্‌।

—থাকবে কেন? কিছু খাওয়াও তো দরকার। ওই তো যাচ্ছে—ডাকব?

—ডাকো।

প্রভাত গলা বাড়াল: বয়—এই বয়—

রেলওয়ে রেস্তোরাঁর বয় এসে দাঁড়াল, জানলার সামনে।

—ব্রেক ফাস্ট—

—টোস্ট—এগ—পরিজ—পটেটো চিপস্‌—

—ঠিক হ্যায়—লাও।

মণিমালা আস্তে আস্তে বললে, আমার জন্যে ডিম আনতে বারণ করে দাও। আমি ডিম খাই না।

প্রভাত শুকনো হাসি হাসল। আগের মতো এখনো সহজ সুন্দর ভাবে হাসত পারছো না। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে কাটানো অনেক রাত্রিতে প্রভাতের যে হাসি তার রক্তের মধ্যে ঝিন্‌-ঝিন্‌ করে সুর জাগিয়েছে—সে হাসি এখনো ফুটছে না ওর মুখে।

মণিমালা শিউরে উঠল। যদি আর কোনো দিন না-ই ফোটে? যদি এইখানেই ফুরিয়ে যায়—যদি কয়েকটা হল্‌দে পাতার মতো শুকিয়ে ঝরে যায় এইখানেই? ভবিষ্যৎ? আজকে ট্রেনের কামরার এই ভারটা যদি সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে? যদি আরো

—আরো—ভারী হয়ে উঠতে থাকে দিনের পর দিন? যে প্রলম্বিত ছায়াটা পেছনে পেছনে অনুসরণ করে আসছে, সে যদি মেঘের মতো—তার পরে রাত্রির মতো কালো হয়ে আসে চার দিকে?

প্রভাত আর একটা সিগারেট ধরাল। বড় বেশি সিগারেট খাচ্ছে—বড্ড ঘন-ঘন।

—অভ্যেস করে নাও। এখন তো পথে বেরিয়ে পড়েছি—কোন্ দিন কী জুটবে কে জানে?

মণিমালা প্রতিবাদ করল না। বলতে পারল না—ডিমের গন্ধ ও একেবারে সইতে পারে না—একটুখানি মুখে গেলেই সবটা বমি হয়ে যায়।

একটু আগেই ভাবছিল, জীবনের উজানে চলতে চলতে নিজের সব ভাবনাকে ভাসিয়ে দিয়েছে ভাঁটায়। কিন্তু সব তো দিতে পারে নি। এখনো রয়ে গেছে—অনেক রয়ে গেছে এখনো। ভোরে উঠেই যদি প্রভাত দাড়ি কামাত, রাত্রের ঘামে-ভেজা কয়লার দাগ-লাগা কোঁচকানো জামাটাকে বদলে নিত, যদি প্রত্যেক দিন যেমন করে ছিমছাম হয়ে অফিসে বেরোয়, তেমনি ভাবে আজ সকালেও দেখা দিত মণিমালার কাছে—তা হলে? তা হলে অন্য রকম হত। কিন্তু প্রভাতের এই শুকনো শীর্ণ মুখটা যেন কোন মতেই সে সইতে পারছে না। সেই কান্নাটা—সেই থমকে যাওয়া আর্তনাদ—আবার কাঁপতে কাঁপতে তার গলার কাছে উঠে আসছে, আবার চোখের সামনে দেখা দিচ্ছে সেই ছায়া-নড়া রেলিঙের সারি, আর মনে পড়ে যাচ্ছে, হাওড়া স্টেশন থেকে অনেক দূরের সেই বাড়িতে আর এক মাস সাত দিন পরে নতুন গুড়ের পায়েসের গন্ধ উঠত।

চিন্তাটা চমকে উঠল মণিমালার। খটাং করে আওয়াজ হল

গাড়ির দরজায়। খাকি টুপিপরা একটা মাথা—লোহার হাতলটার একটা পাক—দরজাটার কেমন কাতর শব্দ করে খুলে যাওয়া, তারপরেই টক করে উঠে এল ইউনিফর্ম-পরা একটি মানুষ।

পুলিস। দারোগা।

মুহূর্তে বুকের ভেতরে হিম হয়ে গেল মণিমালার। প্রভাতের ঠোঁটের কোণে সিগারেটটা কেঁপে উঠল একবারের জন্যে।

তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দারোগার চোখে। ভদ্রলোক বসলেন না। দরজার সঙ্গে দেয়ালটায় দাঁড়ালেন হেলান দিয়ে।

—কোত্থেকে আসছেন আপনারা?

ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে আঙুলে ধরল প্রভাত। কালো-হয়ে-যাওয়া মুখটাকে আরো কালো দেখাচ্ছে। অল্প অল্প নড়ছে ঠোঁট, হাত কাঁপছে না কেন সেইটেই আশ্চর্য!

প্রভাত বললে, কলকাতা।

—যাচ্ছেন কোথায়?

—হরিদ্বার।

হরিদ্বার। এতক্ষণে জানল মণিমালা। এতক্ষণে জানল কোথায় চলেছে তারা।

দারোগার চোখ গাড়ির ভেতরে ঘুরতে লাগল: ও। তা এ সমস্ত মালপত্র সবই কি আপনাদের?

—না। এপাশের এগুলো আমাদের—ওপাশের ওগুলো আর এক জনের।

—তিনি কোথায়?

—বলতে পারব না। বোধ হয় চা খেতে গেছেন।

—তিনি কি আপনাদের সঙ্গের লোক?

—না, বর্ধমান থেকে উঠেছেন।

—ও !—দারোগা চুপ করে গেলেন। কিন্তু তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিটা তেমনি ঘুরতে লাগল সারা কামরাটায়।

কী অসহ্য—কী ভয়ঙ্কর স্নায়ু-ছেঁড়া প্রতীক্ষা ! নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পাচ্ছে মণিমালা। দারোগার মুখখানা মিলিয়ে গিয়ে সিনেমার ছবির মতো প্রভাতের বাবার মুখ ভেসে উঠছে তার উপর। প্রকাণ্ড মুখের ওপর প্রকাণ্ড গোঁফ—দু' চোখে ক্রুদ্ধ উদ্ধত দৃষ্টি। মণিমালার চোখের সামনে গাড়িটা দুলতে লাগল। পুলিস। লক্ আপ। কলকাতা। কোর্ট। খবরের কাগজ—কেলেঙ্কারি—

প্রভাত শক্ত হয়ে বসে আছে। ওর সমস্ত পেশীগুলোর কাঠিন্য যেন অনুভব করছে মণিমালা। শুধু সিগারেটটা টানছে ঘন ঘন। একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু কী করতে পারে ? চরম ভয়ঙ্কর মুহূর্তটা না আসা পর্যন্ত কী আর করতে পারে সে ?

—এক্সকিউজ মী—হঠাৎ নড়ে উঠলেন দারোগা। এগিয়ে এলেন এক-পা এক-পা করে। বাঘটা লাফিয়ে পড়বে এক্ষুনি। মণিমালা চোখ বুজতে চাইল, পারল না। চোখের পলক পড়ল না পর্যন্ত—মনে হল ওপর থেকে কে যেন পাতা দুটোকে শক্ত করে টেনে ধরেছে।

দারোগার হাতটা উঠে এল—কিন্তু প্রভাতের কাঁধের ওপরে নেমে এল না। বাঙ্কের ওপরে স্যুটকেসটা টেনে দেখলেন একবার। নীচু হয়ে বাঁধা হোল্ড-অলটাকে নেড়ে দেখলেন এদিক-ওদিক। তারপর ও-পাশে সরে গিয়ে কিছুক্ষণ কালো ট্রাঙ্কটার দিকে তাকিয়ে রইলেন—দুটো টোকা মারলেন তার গায়ে।

আবার ফিরে তাকালেন প্রভাতের দিকে।

—ইনি কখন আসবেন ?

—কী করে বলব বলুন ?

—ও, আচ্ছা।—দারোগা সরে গেলেন দরজার দিকে। আবার গাড়ির হাতল ঘুরল, যেমন ভাবে এসেছিলেন তেমনি টুপ করে নেমে গেলেন—ভীড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল টুপিটা।

অনেকক্ষণের চেপে-রাখা একটা নিঃশ্বাসকে আস্তে আস্তে ছেড়ে দিলে প্রভাত। তাকাল মণিমালার দিকে।

—ভয় পেয়েছিলে, না?—নিজের ভয়টাকে আড়াল করার চেষ্টায় একটা করুণ হাসি দেখা দিল প্রভাতের মুখে।

—নাঃ।—মণিমালাও হাসতে চেষ্টা করল। কিন্তু নিজের হাসির চেহারাটা সে দেখতে পেল না।

—হুজুর—চা—

একটা কর্কশ আকস্মিক শব্দ। দুজনেই চমকে উঠল একসঙ্গে। বয়। একটা বিরাট ট্রে বয়ে এনেছে।

—নিয়ে এসো—

ভেতরে এসে চা নামিয়ে দিয়ে বয় চলে গেল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। প্রভাত চা তৈরি করতে লাগল নিঃশব্দে। টুন-টুন করে আওয়াজ উঠতে লাগল চামচের।

—খাও—

এক টুকরো রুটি তুলে নিলে মণিমালা। কিন্তু খাওয়ার উৎসাহ নিবে গেছে অনেকক্ষণ আগেই। গলার ভেতরে এক রাশ বালির মতো কী যেন খর-খর করছে। জিভের তলায় ক্রমাগত পিন ফুটছে গোটাকয়েক। বুকের মধ্যে একটা চলন্ত হাপর আর এক ঝলক অসহ্য উত্তাপ।

—মাখনটা বেশ ভালো দিয়েছে।—জোর করতে বলতে চাইল প্রভাত।

কাঁকর চিবোনের মতো করে বিস্বাদ রুটির টুকরোটাকে মণিমালা দাঁত দিয়ে গুঁড়ো করতে লাগল। চা-টা অসম্ভব রকমের

তো। চিনির বদলে সুগার-পট থেকে আর কিছু মিশিয়েছে নাকি প্রভাত ?

কিন্তু ওটা ভয়ের স্বাদ। মণিমালা জানে। বীভৎস—ভয়ঙ্কর—অসহ্য ভয়ের স্বাদ। বুকের ভেতরে এক রাশ গন্‌গনে আগুন—আর একটা চলন্ত হাপর—জিভের নীচে পিন ফুটছে।

প্রভাত জিনিসটাকে সহজ করে দিতে চাইল।

—পুলিস ওরকম আসে। খোঁজ-খবর করে। ওটা ওদের ডিউটি। আমি জানতাম।

জানত ? তা হবে! সে-ই ভালো কথা। প্রভাতই জানুক, সে-ই জেনে রাখুক সব কিছু। নিজের সমস্ত জানা—সমস্ত ভাবাকেই কাল রাত্রেই মণিমালা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে—যেমন করে ছুটন্ত রেলগাড়ি থেকে এক টুকরো কাগজকে উড়িয়ে দেয় বাইরে!

ভাবনা গেছে—তবু একটা জিনিস যায় নি। এতক্ষণে তাকে আবিষ্কার করেছে মণিমালা। তার বুকের শিরা স্নায়ুগুলোকে আস্তে আস্তে করাত দিয়ে কাটবার মতো নিষ্ঠুর নির্মম যন্ত্রণা। চোখের পাতা দুটোকে বন্ধ না করতে পারার একটা ভয়াবহ ব্যর্থতা। ঘাড়ের ওপরে যখন বাঘটা লাফ দিয়ে পড়তে যাচ্ছে, তখন অসাড়-অবশ ইন্দ্রিয় নিয়ে অর্ধ-জাগর অমানুষিক প্রতীক্ষা।

প্রভাত ঘড়ির দিকে তাকাল।

—উঃ, এখনও দশ মিনিট দেরি আছে ছাড়তে।

এখনো দশ মিনিট! দশ ঘণ্টা। দশ বৎসর। প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন নগ্ন ত্বকের ওপর এক এক ফোঁটা করে নাইট্রিক অ্যাসিড পড়বার মতো। এই চায়ের পেয়ালা, ওই বিস্বাদ খাবার, প্রভাতের ওই অক্ষম ক্লান্ত সান্ত্বনা—তাদের মধ্য দিয়ে কি ভোলা যাবে এই যন্ত্রণার দাহনকে ?

ভয়ের স্বাদ। ভাবনাকে ফেলে বাসা চলে—কিন্তু ভয়কে ভোলা যায় না কেন? কিছুতেই না?

প্রভাত বললে, পোচ নেবে না?

খানিকটা নিলে মণিমালা। সব সমান এখন। মুখে ওই একটা আস্বাদ ছাড়া কিছুই নেই আর।

সেই মোটা ভদ্রলোক ফিরে এসেছেন। গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে গাইতে এসে বসলেন নিজের জায়গায়। সমস্ত মুখে পেট ভরে খেয়ে আসার একটা নিটোল তৃপ্তি। একেবারে নির্ভাবনা—একেবারে নির্ভয়।

—আপনারা কত দূর?—খুশি হয়ে গল্প করতে চাইলেন। প্রশ্নটা প্রভাতকে, চোখটা মণিমালার উপরে।

—হরিদ্বার।—সংক্ষিপ্ততম জবাব প্রভাতের।

—বেশ ভালো সময় মশাই—বেস্ট টাইম। খুব আরাম পাবেন।—অযাচিত সংবাদ দান। তার পর বিনা জিজ্ঞাসাতেই নিজের খবর: আমিও সঙ্গেই যাচ্ছি আপনাদের। দেরাডুন।

—বেশ তো।—প্রভাত সৌজন্যের হাসি ফোটাতে চাইল মুখে: ভালোই হল।

কিসে ভালো হল? সহযাত্রী হিসেবে ভদ্রলোক খুব লোভনীয় বলে? আগাগোড়া গল্প করতে করতে যাবেন—সেই জন্যে? বিচক্ষণ ব্যক্তির মতো বলে যাবেন, হরিদ্বারে কোন্ ধর্মশালায় থাকার সুবিধে, মুসৌরীর কোন্ হোটেলে সস্তায় সবচেয়ে ভালো খাবার পাওয়া যায়?

তাও মন্দ নয়—মণিমালা ভাবল। নিজের কাছ থেকে কিছুটা আড়াল—ভয়ের হাত থেকে কিছুটা আশ্রয়। এলোমেলো গল্প। খরধার রোদের মধ্যে টুকরো টুকরো মেঘের ছায়া।

—কখনো দেরাডুন গেছেন? ড্যালহাউসি?—ভদ্রলোকের

আবার জিজ্ঞাসা। চোখের দৃষ্টিটা সমানে মণিমালার ওপর—একটু ক্লেদাক্ত যেন। তা হোক। মণিমালা জানে, যে কারণে প্রভাত তাকে নিয়ে ভাসতে বেরিয়েছে, সেই কারণেই পথে-ঘাটে অসংখ্য দৃষ্টি লেহন করেছে তাকে। রূপ। আগে গা জ্বলত, এখন উপেক্ষা এসে গেছে। স্তুতির মতোও মনে হয় কখনো কখনো।

প্রভাত বললে, পরিজটা—

—আমি পারব না। তুমি খাও—

—তা বটে।—ভদ্রলোক অনাহূত মন্তব্য করলেন: আজকাল এদের কোয়ালিটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। সে দিত মশাই ইংরেজের আমলে। কলকাতার ফার্স্ট ক্লাস হোটেলের মতো। এখন সব স্বদেশী। কোনো মতে পিত্তিরক্ষা করা।

—যা বলেছেন!—এক চামচে পরিজ মুখে দিয়ে প্রভাত জবাব দিলে। খেতে ভালো লাগছে না—তবু জোর করে খাচ্ছে। খেতে হচ্ছে মণিমালাকে অভয় দেবার জন্যে, নিজে এতটুকু ভয় পায় নি সেইটে প্রমাণ করবার জন্যে। মণিমালা আবার শিউরে উঠল। ভবিষ্যৎ? বিস্বাদ-বিতৃষ্ণ মুখে জোর করে কত দিন খাওয়া চলে? যদি কখনো—

—নাইনটিন থার্টি ফাইভে একবার কেলনারের হোটেলে—

ইংরেজ আমলে খাওয়ার একটা অলৌকিক কাহিনীই বোধ হয় শুরু করতে যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক, এমন সময় আবার ঘটাং করে ঘুরল গাড়ির হাতল। দরজার বাইরে হলদে টুপি। রঙীন পাগড়ি আরো গোটা কয়েক।

এবার একা দারোগা নন—চারজন পুলিস সঙ্গে।

রুখতে পারল না মণিমালা, কিছুতেই না। একটা তীব্র আর্তনাদ প্রেতকান্নার মতো বেরিয়ে এল গলা চিরে। হাত থেকে চামচেটা পড়ে গেল প্রভাতের—দুধের পাত্রটা উলটে পড়ল ট্রের

ওপর। প্রভাত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—যেন দারোগা কিছু করবার আগে সে-ই তাকে আক্রমণ করে বসবে।

বলতে যাচ্ছিল মণিমালা। বলতে যাচ্ছিল, কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না আপনাকে। আমরা বাড়ী ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি—গ্রেপ্তার করুন আমাদের। চালান করে দিন কলকতায়—মুক্তি দিন এই ভয়ের যন্ত্রণা থেকে। কিন্তু সে কিছু বলবার আগে, প্রভাত একটা কিছু করে ফেলবার আগেই, দারোগা কথা কইলেন।

—আপনাদের ডিস্টার্ব করলাম—কিছু মনে করবেন না। আমার দরকার এই ভদ্রলোককে আর ওই কালো ট্রাঙ্কটাকে।

মোটা ভদ্রলোকের মুখের ওপর দিয়ে কী যেন দুলে গেল। কিন্তু মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্যে। তার পরেই একটা সক্রোধ গর্জন শোনা গেল তাঁর।

—কী চান আপনারা? কী রাইটে আপনারা ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জারের ওপর এমন ভাবে উপদ্রব করেন?

দারোগা হাসলেন। শ্লেষ-মেশানো নিষ্ঠুর হাসি।

—কী রাইট—এখুনি জানতে পারবেন। দয়া করে ট্রাঙ্কটা একবার খুলুন।

মোটা ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন—মুখের ওপর দিয়ে আবার কী যেন দুলে গেল তাঁর। তারপর প্রশান্ত হতাশ গলায় বললেন, টের পেয়েছেন তা হলে? নাঃ, আপনাদের টিকটিকিগুলোর জ্বালায় নিশ্চিন্তে আর ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাবে না মশাই।

দু সের আফিংশুদ্ধ ট্রাঙ্ক, মোটা ভদ্রলোক আর পুলিসের দল নেমে গেল গাড়ি থেকে।

ট্রেন চলেছে। ঘটাং-ঘটাং করে পার হচ্ছে লাইনের জোড়। এলোমেলো সিগন্যাল। থেমে-থাকা মালগাড়ি, শান্ট-করা এঞ্জিন,

রেলওয়ে কোয়ার্টার, গোটা কয়েক লাল-শাদা বাড়ি। ধূ—ধূ মাঠ তার পরে। মরা চেহারার বাবলা গাছ, অতিকায় রুক্ষ পাথরে আয়নার মতো রোদ-চমকানো পাহাড়ের টিলা, গহুমের ক্ষেত, অড়হরের ফালি, ডোবার জলে কাদামাখা মহিষ।

পুলিস চলে গেছে। উইট্‌নেস্ হিসেবে নিয়ে গেছে নাম। রিজার্ভেসন টিকিটে মিস্টার বি. চৌধুরী আর আর মিসেস্ বি. চৌধুরীর যে মিথ্যে নাম ছিল, সেইটেই। আর নিয়ে গেছে কলকাতার একটা অবাস্তব ঠিকানা।

গাড়িতে এখন ওরা ছাড়া আর কেউ নেই। না, আরো কেউ কেউ আছে বই কি। সেই প্রলম্বিত ছায়াটা। সেই পাথরের ভার। সেই তীক্ষ্ণ তিক্ত ভয়ের স্বাদ।

প্রভাত আবার সিগারেট ধরাল। কালো মুখে আবার সেই জোর-করা হাসি।

—সত্যি, কী কাণ্ডটাই হয়ে গেল! আমি তো দস্তুরমতো চমকে গিয়েছিলুম। প্রায় ভয়ই পেয়েছিলুম বলতে গেলে। আর তোমার মুখের চেহারাটা যা হয়েছিল মণি—

টেনে টেনে প্রভাত হাসল। হাসল সুনিপুণ অভিনেতার মতো।

এর পরে মণিমালাও হাসা উচিত ছিল। উচিত ছিল অনেক বেশি করে—অনেকক্ষণ ধরে হাসা। কিন্তু কিছুতেই হাসতে পারল না মণিমালা। একটা জংশনের পরে আরো একটা জংশন আছে। তার পর আরো—আরো। কতক্ষণ নিজের স্নায়ুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে সে? তারও পরে আরো কালো হয়ে যাবে প্রভাতের মুখ, হয়তো আরো জোর করে খাবারের চামচে মুখে তুলতে হবে—তখন?

মণিমালার ইচ্ছে করতে লাগল প্রাণপণে চিৎকার করে ওঠে একটা। সে চিৎকার এই মাঠ পেরিয়ে—রোদ-ঝলসানো পাহাড়

পেরিয়ে—গহুম-অড়হরের ক্ষেত পেরিয়ে একেবারে কলকাতার বুকে গিয়ে আছড়ে পড়ুক।

—নিয়ে যাও—ধরে নিয়ে যাও আমাদের। আর আমি সইতে পারছি না—

গলার কাছে এসে থর-থর করে চিৎকারটা কাঁপতে লাগল—বেরুতে পারল না। ট্রেন চলল। তপ্ত রোদমাখানো হাওয়ায় কেমন যেন একটা গন্ধ ভেসে এল—ঠিক মনে হল, নতুন গুড়ের পায়সের গন্ধ!

ইণ্টারভিউ

ঠাস্ করে অনিলা একটা চড় বসিয়ে দিলে মিণ্টুর গালে। আর্তনাদ করে বললে, লক্ষ্মীছাড়া, পাজী, বাঁদর! এখন কী পরে আমি রাস্তায় বেরুব?

বাবার হাতে অনেক চড়-চাপড় খেয়ে শক্ত হয়ে গেছে মিণ্টু—ওটা লাগল না। যা লাগল সেটা অপমান। কিছুক্ষণ মুখ চোখ লাল করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মিণ্টু, বিড় বিড় করতে লাগল ঠোঁট, তারপর মুখ ভেংচে বিশ্রী করে বললে, মুখপুড়ী, পেত্নী—আমায় মিছিমিছি মারলি যে? বিষুদ্‌বারে লণ্ড্রী বন্ধ থাকে—আমি কোত্থেকে কাপড় আনব?

দুর্বিনীত ছোট ভাইটার গালে আর একটা চড় বসাতে গিয়ে তার আগেই প্রায় কেঁদে ফেলল অনিলা: তা হলে ওখানে দিলি কেন কাপড়? এখন কি পরে আমি যাই?

—ইচ্ছে হয় বাবার লুঙ্গি পরে চলে যা। আমি কী জানি?—বলেই মিণ্টু ছিটকে গেল সামনে থেকে।

অনিলা এবার সোজা বসে পড়ল মেজের ওপর। দোষ মিণ্টুর নয়। শাড়ি দুখানা ধুতে দেবার সময় কথাটা তার নিজেরই খেয়াল ছিল না। ইণ্টারভিউয়ের চিঠিটা আসবার পর থেকে এই তিন দিন ধরে যে আশঙ্কা আর উত্তেজনা তার বুকের মধ্যে দোল খেয়েছে—তাতে বৃহস্পতিবারের কথাটা মনে ছিল না একেবারেই।

এগারোটায় সময় দিয়েছে। এখন ন'টা। অর্থাৎ এক ঘণ্টা সময় আছে হাতে।

সকালের দিকে নিজের হাতে ময়লা একটা শাড়ি কেচে দিলে এতক্ষণে হয়তো শুকিয়ে যেত। কিন্তু আর উপায় নেই এখন।

পরনে যেটা আছে, সেটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরুনো চলে না। বাক্সে খান দুই পরিষ্কার কাপড় আছে বটে। কিন্তু তারা ধোপদুরস্ত হলেও এমন জরাজীর্ণ যে লজ্জা নিবারণ হওয়া শক্ত।

একটা ছোট্ট মাটির ভাঁড় হাতে মা এগিয়ে এলেন। বললেন, এমন করে যে বসে আছিস এখনো ? উঠে চান করতে যা—নইলে পরে যে নাকে-মুখে গুঁজে দৌড়োতে হবে। তোর জন্যে দই আনিয়েছি চার পয়সার, শুভকাজে যাচ্ছিস—একটু মুখে দিয়ে নিবি।

—ফেলে দাও তোমার দই।—অনিলা কেঁদে উঠল : কী করে যাব আমি ? এই নোংরা ছেঁড়া শাড়ি পরে বেরুব নাকি বাড়ি থেকে ?

—কেন ? কাপড় দেয় নি লণ্ড্রী থেকে ?

—আজ যে বিষুদ্‌বার। লণ্ড্রী বন্ধ।

মা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। শুকিয়ে এতটুকু হল মুখ।

—একটু হিসেব করে দিস নি ?

অনিলা জবাব দিলে না। কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

মা আস্তে আস্তে একখানা হাত রাখলেন মেয়ের মাথার ওপর। নরম স্নেহসিক্ত গলায় বললেন, কাঁদিস নি মা—উঠে চান করতে যা। কাপড়ের ব্যবস্থা আমি করছি।

অনিলা মুখ তুলল। জলভরা চোখ চমকে উঠল বিদ্যুতের মতো।

—তার মানে তোমার সেই বুটীদার সবুজ ঢাকাই শাড়িটা ? কক্ষনো না। ও আমি পরতে পারব না।

—কেন ? ঢাকাই শাড়ি কি আজকাল আর কেউ পরে না ?

—কেন পরবে না ? তাই বলে পঁচিশ বছর আগেকার বিয়ের শাড়ি নয়। আমার তো মাথা খারাপ হয় নি যে যাত্রার দলের

রাণী সেজে আমি ইণ্টারভিউ-বোর্ডের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। অথচ—

অনিলা আবার ভেঙে পড়ল: অমিতবাবু আমার জন্যে এত চেষ্টা করছেন—হয়তো চাকরিটা হয়েও যেত।

মা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা।

—আচ্ছা, তুই একটু বোস্। আমি আসছি।

অনিলা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। তেতলার সিঁড়ি বেয়ে মা উঠে যাচ্ছেন ওপরে।

একটা অপমানিত প্রতিবাদ গলা পর্যন্ত এসেও থমকে গেল অনিলার। ওপরতলার কলেজে-পড়া মনীষার কাছে মা শাড়ি ধার করতে চলেছেন। দোতলা-তেতলা নিয়ে ওরা থাকে--বড়-লোক। নীচের তলার এই দীন ভাড়াটেদের প্রতি ওদের তাচ্ছিল্য আর অনুকম্পার শেষ নেই। মুখ ফুটে হয়তো স্পষ্ট করে কিছু বলে না, কিন্তু চালচলনে প্রতি মুহূর্তে ওদের উপেক্ষার উত্তাপ সারা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। কলেজ-বাসের হর্ন বাজলে রূপবতী মনীষা যখন চশমাশুদ্ধ নাকটাকে প্রায় আকাশে তুলে বেণী দুলিয়ে সিঁড়ি দিয়ে খট্‌খট্ করে নেমে যায়, তখন থার্ড ডিভিশনে ম্যাট্রিক পাস কালো শীর্ণ চেহারার অনিলা তেল-হলুদমাখা কাপড় নিয়ে সসম্মানে তিন হাত দূরে সরে দাঁড়িয়ে থাকে।

কতদিন প্রতিদ্বন্দ্বীর হিংস্র জ্বালা চোখে নিয়ে অনিলা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে মনীষাকে। ভালো খায়, ভালো পরে—রূপ আর স্বাস্থ্যও ভগবান দু হাতে ঢেলে দিয়েছেন ওকে। অবিচার কেবল তারই বেলায়। একখানাও বই ছিল না, পরের কাছে চেয়ে-চিন্তে কোনোমতে থার্ড ডিভিশনে তাকে পাস করতে হয়েছে। অভাবের

কালো কুশ্রীতা সে বয়ে এনেছে সর্বাঙ্গে, আধপেটা খাওয়ার জীর্ণতা তাকে ঘুণের মত কাটছে দিনের পর দিন।

জ্বলন্ত চোখের আগুন ঠিকরে কতদিন মনীষার মুখের ওপর একটা পোড়া দাগ এঁকে দিতে চেয়েছে অনিলা। নিজেকে ঘৃণা করেছে—সংসারকে ঘৃণা করেছে—ঘৃণা করেছে মা-বাবা সবাইকে। কতদিন সন্ধ্যায় একটি ফর্সা সুন্দর ছেলে এসেছে ওপরে—তার সঙ্গে অর্গ্যানে গলা মিলিয়েছে মনীষা—হেসেছে খুশির অপরিমিত উচ্ছ্বাসে, আর অনিলার মনে হয়েছে—'কলিকে'র ব্যথার মতো কী একটা যন্ত্রণা পাক দিয়ে দিয়ে উঠেছে তার সর্বাঙ্গে।

তবু মা ফিরে এলেন সেই মনীষার কাছ থেকেই একখানা শাড়ি নিয়ে।

—এই নে।

একবার অনিলা শাড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল। সাদা তাঁতের শাড়ি, কিন্তু দামটা আন্দাজ করতে সময় লাগে না। চমৎকার কালো পাড়ের অসংখ্য দাঁতগুলো যেন তাকে ভেংচি কাটছে—কাপড়টার মসৃণ স্পর্শ কাঁটার আঁচড়ের মতো তার গায়ে লাগল।

মা মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। কয়েক মুহূর্ত। তারপর যেন নিজের কাছেই কৈফিয়ৎ দিলেন একটা।

—কী করা যাবে বল্! কোন উপায় তো নেই! আজকের কাজটা উদ্ধার হয়ে যাক—তারপর ধুয়ে ফেরত দিয়ে এলেই চলবে।

অনিলা উঠে দাঁড়াল। ঘড়ির কাঁটা সাড়ে ন-টার ঘরে। নিজেকে নিয়ে ক্ষত-বিক্ষত হবারও সময় নেই এখন।

একশো ছয় ডিগ্রির কলকাতা। বেলা দশটা বাজতে না বাজতেই নেমেছে আগুনের ঝরনা। ট্রাম-স্টপের পাশে কয়েকটা পোস্টের সরু সরু সংকীর্ণ ছায়া। তারই একটার তলায় দাঁড়াল অনিলা।

প্রাইভেট বাস উঠে গিয়ে আরো চমৎকার হয়েছে কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট। স্টেট্ বাসের দিকে তাকাতেই ভয় করে। ট্রামের পা-দানি ছাড়িয়ে এতখানি দূরে মানুষগুলো যে কী ধরে ঝুলে রয়েছে—সে রহস্য হয়তো তারাও জানে না। অফিস-টাইমে কলকাতার মাটিতে মাধ্যাকর্ষণ থাকে না খুব সম্ভব।

পর পর তিনখানা ট্রাম ছেড়ে দিলে অনিলা। কিন্তু আর দাঁড়ানো চলে না। অসহ্য গরমে মাথা ঘুরছে—চোখের সামনে বিসর্পিল ধোঁয়ার রেখা। গায়ের জামা-কাপড়গুলো ভিজে কম্বলের মতো দম-আটকানো আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরেছে। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে হয়তো ঘুরেই পড়ে যাবে মাটিতে। তার চাইতেও বড়ো কথা, ঠিক এগারোটায় ইণ্টারভিউয়ের সময় দিয়েছে।

চতুর্থ ট্রামে শেষ পর্যন্ত উঠেই পড়ল। কী করে যে উঠল নিজেই বুঝতে পারল না অনিলা। পিণ্ড-পাকানো একতাল খেজুরের মতো গলদ্ঘর্ম বিপন্ন মানুষগুলো ওরই মধ্যেই কী উপায়ে যেন পথ করে দিলে—কলকাতার অফিসযাত্রীদের যোগশাস্ত্রের নিয়মে অণিমা-লঘিমা সিদ্ধি আয়ত্ত আছে বোধ হয়।

লেডীজ সীট এবং আশেপাশের অনেকগুলি আসন অনেক আগেই ভাগ্যবতীরা জুড়ে বসেছে। ট্রামের ঘুরন্ত পাখার নীচেও হাঁড়ি-কাবাবের মতো সেদ্ধ হচ্ছে পুরুষেরা। তারই ভেতরে একটি মেয়েদের আসনের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইল অনিলা। তার জন্য যে-জায়গাটুকু ছেড়ে দিতে হল, তাই নিয়েই অসন্তুষ্ট গুঞ্জন বাজতে লাগল আশেপাশে।

—এই ভিড়ের মধ্যে এরা যে কেন ওঠেন!

—স্পেশ্যাল বাস দিলেই হয় ওঁদের জন্যে।

—দিয়েছিল তো একবার। কিন্তু ওঁরা তাতে খুশি নন। মানে বাড়িতেও ওঁরা আমাদের জ্বালাচ্ছেন, অফিসে অর্ধেক টেবিল

জুড়ে বসেছেন, ট্রামেই বা সে অধিকারটুকু ছাড়বেন কেন বলুন ?

অনিলা শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল। কথাগুলো কানে যাচ্ছে কিন্তু মনে দোলা দিচ্ছে না। অভ্যেস হয়ে গেছে শুনতে শুনতে। এ পক্ষেরও দোষ নেই। বোঝার ওপর শাকের আঁটি কারোই ভালো লাগবার কথা নয়।

নিজের কথাই ভাবছিল অনিলা। থার্ড ডিভিশনে পাস করবার পরে এতদিন ধরনা দিয়েছে অনেকজায়গায়। একটা স্কুলে মাস তিনেকের জন্যে টেম্পোরারি চাকরি হয়েছিল—ত্রিশ টাকা মাইনের। আর কিছু জোটে নি তারপর। মধ্যে মধ্যে নিচু ক্লাসের মেয়েদের টিউশন আসে তুটো একটা—কখনো দশ টাকা, কখনো বড় জোর পনেরো টাকা। তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। এক মাস থাকে তো তু মাস থাকে না।

ওদিকে বাবা পঁচাত্তর টাকা মাইনের মাস্টারি নিয়ে পড়ে আছেন নদীয়ার এক রিফিউজি ক্যাম্পে। নিজের খরচ-খরচা চালিয়ে তাই থেকে কখনো পাঠান চল্লিশ, কখনো পঁয়তাল্লিশ। কলকাতায় আঠারো টাকা ঘর ভাড়া দেবার পর যা বাকি থাকে তার ওপর নির্ভর তাদের চারটে প্রাণীর : সে, মা, মিন্টু আর মাণিক। তাই বাঁচবার এবং সকলকে বাঁচাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয় অনিলাকেই। আর সে চেষ্টা করতে গিয়ে তিলে তিলে টের পায়, তার চোখের সামনে সূর্য-তারার আকাশটা একটু একটু করে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত এসেছে অমিত। দূর-সম্পর্কের আত্মীয় আর শুধু আত্মীয়ই নয়—আজকাল অনিলার সামনে থেকে থেকে কেমন কথা আটকে যায় অমিতের, চোখের দৃষ্টিটা মধ্যে মধ্যে কেমন আবছা হয়ে যায়! কিন্তু রক্তে দোলা লাগে না অনিলার। কেমন হাসি

পায়, কেমন দুঃখ হয় অমিতের জন্যে। এই কালো চামড়ার জীর্ণ অনিলার মধ্যেও যে একটা কিছু অবিষ্কার করেছে অমিত, তার কৃতিত্ব সেইখানেই।

আর সেইজন্যেই এই চাকরিটার জন্যে যথাসাধ্য করছে অমিত। প্রাণপণে। ভেকান্সি তাদেরই অফিসে। ডিয়ারনেস্ মিলিয়ে টাকা ষাটেক দাঁড়াবে।

খবরটা নিয়ে এসেছিল খুশিতে ঝলমল করতে করতে।

—জানেন পিসিমা, এই একটা পোস্টের জন্যে চার শোর বেশি দরখাস্ত পড়েছিল! এন্তার গ্রাজুয়েট—এম. এ.ও জনপঞ্চাশেক। তবে হেডক্লার্ক আমায় খুব ভালোবাসেন—একটা ইণ্টারভিউয়ের ব্যবস্থা আমি করিয়েছি।

ইণ্টারভিউ। চার শোর মধ্যে বাছাই করা কয়েক জনের ইণ্টারভিউ। তার মানে পঁচিশ পার্সেনট্ আশা আছে। তা ছাড়া আছেন হেডক্লার্ক—তিনি অমিতকে স্নেহের চোখে দেখে থাকেন।

মা সঙ্গে সঙ্গেই কালীঘাটেব কালীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। ছলোছলো চোখে বললেন, দ্যাখো বাবা—ঠাকুরের মনে কী আছে!

অমিত ঠাকুরের কথা ভাবল না—বলে চলল নিজের কথাই।

—হেডক্লার্ক বললেন, ম্যাট্রিক পাস ক্যাণ্ডিডেট্‌কে যে নেব, এক্‌স্ট্রা কোয়ালিফিকেশন তো কিছু চাই! শর্টহ্যাণ্ড, টাইপ-রাইটিং কিছু জানে? আমি বললাম, স্যার, দারুন ইণ্টেলিজেনট্ মেয়ে—শিখে নিতে এক মাস। শুনে বেশ নরম হয়েছেন। এখন ইণ্টারভিউতে—

হ্যাঁ, ইণ্টারভিউতে। তবে এ কথা কে আর না জানে যে এ-সব চাকরিবাকরীর ব্যাপারে ইণ্টারভিউ নিছক একটা উপলক্ষ মাত্র! ভেতরে যার জোর আছে তারই হয়ে যাবে। আর তা

ছাড়া হেডক্লার্ক যখন এতখানি পর্যন্ত ভরসা দিয়েছেন, তখন তো নিশ্চিতই বলা চলে প্রায়।

একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রাম থেমেছে। আচমকা টলে গিয়ে পাশের এক ভদ্রলোকের গায়ের ওপর পড়তে পড়তে সামলে নিলে অনিলা। আশা আর স্বপ্নের রঙিন কুয়াশাটা প্রজাপতির ছেঁড়া পাখার মতো মিলিয়ে গেল পিণ্ডাকার ভিড়ের ঘর্মাক্ত গ্লানির মধ্যে।

এরই ভেতরে একবার ঈর্ষ্যাতুর দৃষ্টি অনিলা বুলিয়ে নিলে পাশের সীটের মেয়ে দুটির দিকে। পরিচ্ছন্ন অথচ মার্জিত বেশ-বাস, চেহারায় আত্মপ্রত্যয়। বলে দিতে হয় না—ওরা অফিসে কাজ করে। নিজেদের পায়ে দাঁড়িয়েছে—স্বীকৃতি পেয়েছে জীবনে—অধিকার পেয়েছে। অনিলা লুব্ধভাবে চেয়ে রইল। ছিঁড়ে-যাওয়া স্বপ্নটা আবার যেন জুড়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

ট্রাম বাঁক নিচ্ছে ডালহাউসি স্কোয়ারের দীঘির ধার দিয়ে। হুড়মুড় করে লোক-নামা শুরু হয়েছে। পরের স্টপে নামতে হল অনিলাকেও।

রক্তে ঝড়। হৃৎপিণ্ডে তুফান। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে ফেলল অনিলা। যেন এইমাত্র বৃষ্টির জলে ধারাস্নান করে এসেছে সে।

এখনো প্রায় কুড়ি মিনিট বাকি এগারোটা বাজতে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তবু ছটফট করছিল অমিত।

—এসে গেছ! চলো ওপাশে। আমি কাজ ফেলে তখন থেকে অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে।

কপাল-মুখ বেয়ে আবার সেই ঘামের ঝরনা। বুকের ভেতরে ঝড়।

—আর কেউ এসেছে অমিতদা?

—এসেছে মানে ? দশটা থেকেই প্রায় ভর্তি হয়ে আছে ঘর। তোমার মতো দু-একজন ছাড়া সবাই এসে গেছে।

ঘর প্রায় ভর্তি ! কেমন থমকে গেল অনিলা।

—ডেকেছে কত জনকে ?

—জনা পঁচিশেক হবে।

—পঁচিশ জন !

অমিত বিব্রতভাবে মাথা চুলকোল : তাতে আর কী হয়েছে ! আমি তো বড়বাবুকে বলেই রেখেছি। দেখা যাক না কী হয় !

অন্ধকারে ওই একটুখানি আশার ক্ষীণ রেখা। অমিতের নিজের অফিস। কিন্তু সেই অফিসের প্রকাণ্ড হলঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে, দু পাশের অসংখ্য টেবিলে অসংখ্য মানুষকে দেখতে দেখতে সমস্ত মনটা নিবে যেতে চাইল অনিলার। একটা বিরাট অরণ্য যেন। আর এই অরণ্যের ভেতরে অল্পবয়েসী নতুন কেরানী অমিতকে ভারী নগণ্য মনে হতে লাগল। অমিতের চোখেও কেমন ভীরু—কেমন সন্ত্রস্ত দৃষ্টি ! আলোর রেখাটাকেও যেন ভালো করে দেখা যাচ্ছে না এখন।

—কত জনকে ডেকেছে একটা পোস্টের জন্যে ?—একটা কণ্ঠস্বর।

—এ যে দেখছি প্রায় বিউটি-প্যারেডের ব্যবস্থা !—আর একটা চাপা মন্তব্য।

—শ্-শ্-শ্-আস্তে ! শুনতে পাবে।—তৃতীয় জন।

মাথা নিচু করে এগিয়ে চলল অনিলা। অমিতের পায়ের কাবলী চটিজোড়ার ওপর চোখ রেখে। কিন্তু কত দূরে নিয়ে চলেছে অমিত ? এ পথ কি কখনো ফুরুবে না ?

—এই যে, বোসো এখানে।—একটা সুইং ডোর খুলে ধরল অমিত।

ছোট একটা ঘর। খান কয়েক চেয়ার, গোটা দুই বেঞ্চি। চারপাশে কতগুলো পুরোনো আলমারী, তাদের ভেতরে এব মাথার ওপরে ফাইলের ধূলিধূসর স্তূপ। সমস্ত ঘরে একটা মৃত জীর্ণ গন্ধ। পুরনো কাগজ আর ধূলোর গন্ধ।

সেই ঘরের ভেতরেই পনেরো-ষোলোটি মেয়ে বসে আছে চুপ করে। ত্রিশ থেকে আঠারো পর্যন্ত। অনিলাকে দেখে যেন তাদের গম্ভীর মুখে আরও একটুখানি ছায়া পড়ল। আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। কে জানে, হয়তো এই-ই ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে এসেছে!

একটা বেঞ্চিতে একটু জায়গা খালি আছে। অনিলা এগোল সেই দিকেই।

অমিত বললে, আমি যাই—কাজ ফেলে এসেছি। তুমি বোসো এখানে। সময় হলেই ডাকবে।

অনিলা জবাব দিল না, বেঞ্চের এক কোণায় বসে পড়ল চুপ করে। অমিতের কাবলী চটির দ্রুত আওয়াজটা মিলিয়ে গেল ক্রমশ—কিছুক্ষণ তাই কান পেতে শুনতে লাগল অনিলা।

মাথার ওপর একটা পাখা ঘুরছে—তার একটানা শাঁ-শাঁ আওয়াজ। কেমন বিশ্রী অস্বস্তিকর পুরনো কাগজের গন্ধটা। ছবির মতো নিঃশব্দে বসে রইল এতগুলি মেয়ে। সবাই ভাবছে—একসঙ্গেই ভাবছে। আশা, আশঙ্কা আর অনিশ্চয়তার ভাবনা।

সুইং ডোর খুলল। আর একজন। আরও একজন। ঘরের সবাই শীতল চোখ তুলে অভ্যর্থনা করল তাদের। এবার অনিলার মুখেও ছায়া পড়ল। আরও কতজন আসবে? আরও কতগুলি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে তাকে?

একজন অনিলার পাশে এসে বসল, অন্য জন চলে গেল আরেক দিকে।

একটি মেয়ে স্তব্ধতা ভাঙল। হাতের বেঁটে ছাতাটা একবার ঠুকল মেঝের ওপর। তারপর পাশের মেয়েটিকে বললে, মোটে তো একটা ভেকান্সি। এতজনকে ইণ্টারভিউ দেবার কী দরকার ছিল?

—ওদের মর্জি।—শুকনো গলার জবাব এল একটা।

অনিলা দেখতে লাগল তাকিয়ে তাকিয়ে। অধিকাংশেরই অবস্থা তার মতো। শীর্ণ চেহারা, ভাঙা মুখ, উদ্‌ভ্রান্ত বিষণ্ণ চোখ। ফরসা জামাকাপড় পরে এসেছে বটে, কিন্তু কতজনকে তার মতোই যে মনীষার কাছ থেকে শাড়ি ধার করে আনতে হয়েছে তা তারাই জানে। বাইরে যতই আত্মগোপন করতে চেষ্টা করুক, অভাবের রূপটা ধরা পড়ে ক্ষুধার্ত মুখের ক্লান্ত রেখায় রেখায় আর পায়ের জুতোর বর্ণহীন দৈন্যে। বিবাহিতাও আছে জনকয়েক—তারা যেন আরও শঙ্কিত—আরও বিপন্ন। একজনের একখানা অস্থিসার হাত চোখে পড়ল অনিলার—অস্বাভাবিক শাদার ওপর শাঁখাটাকে আরও অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে—কঙ্কালের হাত যেন। অনিলা চোখ সরিয়ে নিলে।

তবু ব্যতিক্রমও আছে। এর মধ্যেই দু-একজন এসেছে দস্তুরমতো সাজসজ্জা করে। ঠিক মুখোমুখি ওদিকের চেয়ারে যে মেয়েটি বসেছে, তাকে দেখলে ঘৃণা হয়ে যায় জাতটার ওপরে। কী বিশ্রী ব্লাউজ পরে এসেছে—কী নির্লজ্জ কাপড় পরবার ধরণ! ঠোঁটের উগ্র রঙ যেন চোখে আঘাত করে। যদি বিদ্যা আর সুপারিশে না কুলোয়—তা হলে বোধ হয় অন্য অস্ত্র প্রয়োগ করে দেখবে একবার।

পাখাটা একটানা বাতাস কাটছে। ছায়ায় ভরা ঠাণ্ডা ঘর—তবু কেমন গরম লাগছে হাওয়াটা। অদ্ভুত নিস্তব্ধতার মধ্যে কেটে চলল সময়।

দশ মিনিট। পনেরো মিনিট। বিশ মিনিট।

একজন হাতঘড়ির দিকে তাকাল।

—সোয়া এগারোটা।

কেউ জবাব দিল না।

আরও দশ মিনিট। একটা বেয়ারা দরজা ঠেলে উঁকি মারল একবারের জন্যে। চোখের কোণে চাপা কৌতুক। যেন চিড়িয়াখানার জন্তুগুলোকে দেখতে এসেছে একবার।

কথা বললে সেই রঙ-মাখা মেয়েটিই, তুলিতে-আঁকা ভুরু দুটো বাঁকিয়ে।

—সাড়ে এগারোটা তো বাজে। আমাদের ইণ্টারভিউ কখন?

—বড় সাহেব এখনো আসেন নি।—সুইং ডোর ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য হল বেয়ারা। দরজার পাল্লা দুটো দুলতে লাগল কিছুক্ষণ।

আবার সেই নিস্তব্ধ প্রতীক্ষা। পাখা থেকে উছলে-পড়া গরম হাওয়া। কোথায় দ্রুত লয়ে একটা টাইপ-রাইটার ছুটেছে, তার অবিশ্রাম আওয়াজ। কয়েকটা এলোমেলো কণ্ঠস্বর। জুতোর শব্দ। থেকে থেকে কলিং বেলের তীক্ষ্ণ গুঞ্জরণ। দূরের রাস্তা থেকে মাঝে মাঝে ট্রামের ঘণ্টা। বাইরে কোথাও কার্নিসে কাক এসে বসেছে একটা—তীব্র কর্কশ গলায় ডেকে উঠল বার কয়েক।

—বারোটা বাজে।—হাতে ঘড়িওয়ালা মেয়েটি জানাল।

—যদি নিজেরাই টাইম ঠিক না রাখতে পারে, তা হলে এ-ভাবে হ্যারাস্ করবার কী দরকার?—আর একজন।

রঙ-মাখা মেয়েটি নকল ভেলভেটের হাতব্যাগ খুলে লজেন্স বের করলে গোটা কয়েক। সামনের বিবাহিতা মহিলাকে জিজ্ঞেস করলে, খাবেন?

—না, ধন্যবাদ।—একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর।

পাখাটা হাওয়া কাটছে একটানা। লজেন্সের সেলোফোন

কাগজটা হাওয়ায় উড়তে উড়তে একটা আলমারির তলায় গিয়ে আশ্রয় নিলে। অনিলা ঘোর-লাগা চোখে দেখতে লাগল।

সুইং ডোর খুলে গেল। সেই বেয়ারাটা।

—তরুলতা সেনগুপ্ত ?

কঙ্কালসার হাতে শঙ্খবলয়পরা মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। একটা চঞ্চলতার ঢেউ বয়ে গেল বাকী সকলের মধ্যে। অনিলার মাথার ভেতরে আর একটা রক্তের ঢেউ আছড়ে পড়ল।

তরুলতা সেনগুপ্ত বেরিয়ে গেল। অনিলা দেখতে পাচ্ছিল, তার পা দুটো কাঁপছে।

সমস্ত ঘরে একটা বৈদ্যুতিক অস্থিরতা। মুখের ঘাম মুছল কয়েকজন। নড়ে-চড়ে যেন প্রস্তুত হয়ে বসল জন চারেক।

—কী জিজ্ঞেস করবে বলুন তো?—একটা ফিস্‌ফিসে আওয়াজ।

—কী করে জানব?—আর একজন হেসে জবাব দিতে চাইল, কিন্তু হাসিটা ফুটতে পারল না।

আরও পাঁচ মিনিট। কলিং বেলের ঘণ্টা। জুতোর আওয়াজ। দ্রুত লয়ের টাইপ-রাইটার। প্রত্যেকটা শব্দ এখন এক-একটা তীর হয়ে হৃৎপিণ্ডে এসে বিঁধছে।

সুইং ডোর খুলল। তরুলতা সেনগুপ্ত ফেরে নি, ফিরেছে সেই বেয়ারাটা। একটা ছোট স্লিপ থেকে হোঁচট খেয়ে খেয়ে নাম পড়ল : অঞ্জনা রায় চৌধুরী ?

অনিলার পাশের মেয়েটি উঠে দাঁড়াল।

ঝড়ের ভেতরে পাখি যেমন নিজের দোল-খাওয়া বাসাটার ভেতরে প্রাণপণে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে—তেমনি বসে রইল অনিলা। নিজের বুকের শব্দটা টাইপ-রাইটারকে ছাড়িয়ে উঠেছে এখন।

সময়। প্রত্যেকটি মিনিট পার হচ্ছে এক-এক ঘণ্টার মতো। পাখার হাওয়াটা অসহ্য গরম।

স্লিপের পর স্লিপ। উত্তেজনার এক-একটা ইলেক্‌ট্রিক্ 'শক্'। তারপর আস্তে আস্তে সমস্ত চৈতন্য অসাড় হয়ে আসতে লাগল। কতক্ষণ কেটেছে? এক ঘণ্টা—দু ঘণ্টা—তিন ঘণ্টা? ঘর খালি হচ্ছে একের পর এক।

অনিলার পালা এল যখন আর তিনজন বাকী।

—অনিলা পাল?

অসাড় পা দুটো টেনে বেরুল অনিলা। কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে মাথার ভেতরে। ত্রিশ গজ হেঁটে যেতে হল, মনে হল তিন শো মাইল পার হচ্ছে।

আর একটা সুইং ডোর। একটা কেবিন। প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিল। ঘরে নীলচে ছায়া। গদী-আঁটা চেয়ারে দুটি মানুষ। সামনে ফাইল।

অনিলা দাঁড়াল। থর থর করে কাঁপছে হাটু দুটো।

—অনিলা পাল?—ফাইল থেকে মুখ তুলল একজন।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।—অনিলার মনে হল নিজের গলাও সে শুনতে পেল না।

—ম্যাট্রিক পাস?

অনিলা মাথা নাড়ল।

—তাড়াতাড়ি সেরে নাও রায়, সময় হয়ে গেছে লাঞ্চের।—আর একজন বললেন। মাথায় টাক, লাল গোল মুখ, গালে একটা প্রকাণ্ড চুরুট।

—এই যে স্যার, প্রায় হয়ে গেছে।—ফাইলের পাতা উল্‌টে আবার প্রশ্ন: শর্ট-হ্যাণ্ড, টাইপিং কিছু জানেন?

—না।

—এর আগে কোনো অফিসে কাজ করেছেন ? এক্‌স্‌পিরিয়েন্স আছে কিছু ?

—না।

—আচ্ছা, আসুন। মায়া মুখার্জি—শেষ কথাটা বেয়ারার দিকে তাকিয়ে।

অনিলা বেরিয়ে এল। সামনে হলঘরের মতো সেই প্রকাণ্ড অফিস। দু পাশের টেবিলগুলোতে কাজ চলছে। অধিকাংশই তাকে লক্ষ্য করল না—এক-আধজন অন্যমনস্কভাবে চেয়ে দেখল কেবল।

এবার আর পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে না অমিত। অনিলাকে একাই বেরিয়ে যেতে হবে। তা ছাড়া অফিসের কোন্ ঘরে—কোথায় যে কাজের ভেতরে ডুবে আছে এতবড় অফিসের একজন জুনিয়ার কেরানী, কে তার খবর দেবে ?

অনিলা জানে। বুঝতে এতটুকুও বাকি নেই। এত বড় অফিসের হেড-ক্লার্ক অমিতের মতো তুচ্ছ প্রাণীকে বড় জোর একটুখানি আশ্বাস দিতে পারেন, একটা ইণ্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তার বেশি কী করতে পারেন আর ?

সামনে রাস্তা। দুপুরের রোদে আগুন জ্বলছে। তার চাইতেও শরীরে বেশি করে জ্বলছে মনীষার শাড়িখানা। ওটার কথা এই মুহূর্তে তার মনে পড়েছে।

কিন্তু সমস্ত জ্বালাকে ছাপিয়েও একটা গভীর করুণায় ভরে উঠেছে মন। নিজের তিক্ত গ্লানিকে ডুবিয়ে দিয়ে মনটা আশ্চর্য বেদনায় ভরে উঠছে।

অমিতের জন্যে। এত বড় একটা অরণ্যের ভেতরে সে যে কতখানি অসহায়—সেই জন্যে।

হার্মাদের এক রাত

হার্মাদ আসছে। হেমন্তের মরা জ্যোৎস্নায় অনেক দূরে দেখা গেছে তাদের একখানা অতিকায় জাহাজের ছায়ামূর্তি। এই দিকেই আসছে তারা—এই গ্রামের দিকেই।

আগে ব্যবসা করতে এসেছিল, কিন্তু ওলন্দাজ-দিনেমার-ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ব্যবসায় লালবাতি জ্বলেছে এখন। আপাতত তাই অনেক সোজা রাস্তা খুঁজে নিয়েছে ওরা। লুঠ আর ডাকাতি—এই ওদের পেশা। ওদের উৎপাতে সমুদ্রে আর বাণিজ্যের বহর যায় না—বড় বড় বন্দর শ্মশান হতে বসেছে। সমুদ্রে শিকার না পেয়ে ওরা গ্রামে গ্রামে এসে হানা দেয়। সোনা-দানা থেকে শুরু করে গরু-ছাগল পর্যন্ত লুঠে নেয়, খুন করে. আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে শেষ করে গ্রাম, জোয়ান ছেলেমেয়েদের গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহাজে তোলে। তারপরে তাদের ভাগ্যে যে কী ঘটে কেউ জানে না। শোনা যায়, দূর বিদেশের বাজারে নাকি জন্তু-জানোয়ারদের মতো বিক্রি করা হয় তাদের।

এই হার্মাদ, অর্থাৎ পর্তুগীজ জলদস্যুরা বাংলা দেশের দিনের আতঙ্ক, রাত্রির বিভীষিকা। গ্রামের পর গ্রাম ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে—বড় বড় নদীর কাছ থেকে প্রাণপণে লোক পালাচ্ছে দূরে, যত দূরে সম্ভব। পোড়ো দালান—পোড়ো বাড়ি। মন্দিরে এখন কেউটে সাপের আস্তানা—মসজিদে শেয়ালের বাসা। মহরমের পরে যেখানে তাজিয়া নামত, সেখানে এখন বুনো শূয়োর বাঁকা দাঁতে মাটি খোঁড়ে; নীলতলায় আর গাজনের ঢাক বাজে না—থমথমে নিশিরাত্রে সেখান থেকে বাঘের ডাক ওঠে।

বাংলা দেশের মানুষ সহজেই পিছু হটে নি। বীরকোঁচা করে কাপড় এঁটেছে, মাথায় বেঁধেছে লাল সালু, তারপর লাঠি-বল্লম নিয়ে এই ফিরিঙ্গী ডাকাতদের রুখবার জন্য এগিয়ে এসেছে মরণপণে। কিন্তু ওদের জাহাজে কামান—হাতে বন্দুক। লাঠি-বল্লম কেমন করে দাঁড়াবে তার সামনে?

খাস নবাবী সদর মুর্শিদাবাদ অনেক দূরে। মাঝে মাঝে ফৌজ আসে সেখান থেকে। কিন্তু বিশাল নিম্নবাংলার নদীনালার মুখ দিয়ে কোন্ নিথর রাত্রে কোন্ গ্রামে যে এই লুঠেরারা হানা দেবে—কে বলতে পারে সে-কথা? খবর পেয়ে থানা থেকে ফৌজদার এসে পৌঁছুবার আগেই তারা দূর-দূরান্তে অদৃশ্য হয়ে যায়, পেছনে পড়ে থাকে লুণ্ঠিত জ্বলন্ত গ্রাম আর ইতস্তত কতগুলো শবদেহ।

তাই নিরুপায় মানুষ বড় বড় নদী আর মোহনার কাছ থেকে ক্রমশই সরে আসছে পেছনে। বাঘের বন কেটে বসতি করেছিল তারা, সাপের ডেরা ভেঙে তুলেছিল চণ্ডী-মণ্ডপ, নিষ্ঠুর নোনা মাটি চষে ফলিয়েছিল ক্ষীরশালী ধান। আজ আবার সেই ভিটে, ক্ষেত-খামার ফেলে পালাতে হচ্ছে তাদের। জানোয়ারের সঙ্গে তারা লড়তে পারে, কিন্তু জানোয়ারের চাইতেও নিষ্ঠুর এই হিংস্র বর্বরের কাছ থেকে তারা আত্মরক্ষা করবে কী করে?

সন্দীপে এই হার্মাদদের বিরাট ঘাঁটি। সেখান থেকেই সারা নিম্নবাংলায় এরা লুঠ-তরাজের রাজ্যপাঠ চালিয়ে চলেছে। বাঙালীর এরা দিনের আতঙ্ক—রাত্রির বিভীষিকা।

হার্মাদ আসছে। হেমন্তের মরা জ্যোৎস্নায় অনেক দূরে দেখা গেছে তাদের বিশাল জাহাজের ছায়ামূর্তি। এই দিকেই আসছে তারা—হ্যাঁ, এই গ্রামের দিকেই। দেখেছে গ্রামেরই দুটি জোয়ান ছেলে—কিশোর আর জয়রাম।

ছোট একখানা ডিঙি নিয়ে রাতের বেলা নদীতে বেরিয়েছিল দু জনে। নদীর ধারের গ্রামগুলোতে আজকাল প্রায়ই এ-ভাবে পাহারা দিতে হয়। কখন কোথা থেকে এই রাক্ষসের দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে গ্রামের ওপর—সে-কথা কেউ নিশ্চয় করে জানে না। আগে থেকে সাবধান হয়ে থাকলে পালিয়ে যাওয়া যায় দূরের জঙ্গলে, কিছু কিছু সম্পত্তিও বাঁচানো যায়। অন্তত মেয়েদের রক্ষা করা চলে, কিছু মানুষের প্রাণ বাঁচে। বাকি যা রইল তা ওদের হাতে সঁপে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই আর।

গ্রামের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে—মুখের সামনে দু হাতের আঙুল জড়ো করে হাঁক তুলল কিশোর আর জয়রাম: হার্মাদ—হার্মাদ আসছে।

হেমন্তের মরা জোৎস্না থরথরিয়ে উঠল, আকাশের আবছা-আবছা তারাগুলো পর্যন্ত ভয়ে শিউরে গেল যেন। ঘরে ঘরে সাড়া উঠল পুরুষের কোলাহলে, ঘুমভাঙা শিশুর কান্নায়, মেয়েদের আর্তনাদে।

—পালাও—পালাও—পালাও—

জঙ্গল আধ ক্রোশ দূরে। মেয়েদের নিয়ে অতদূর পালাতে সময় লাগবে। কখন যে ওরা এসে পড়বে ঠিক নেই। হাতের কাছে যা পাও, তাই নিয়েই ছুটে পালাও। আগে প্রাণ বাঁচুক, মেয়েদের ইজ্জত বাঁচুক, ঘরবাড়ি সম্পত্তির কথা ভাবা যাবে তারপর।

মাঝরাতে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম আর সুখের ঘর ছেড়ে পশুর মতো পালাতে লাগল মানুষ। কেউ আর্তনাদ তুলল, কেউ বুক চাপড়ে চাপড়ে কাঁদল, কেউ আকাশের দিকে মুখ তুলে নিষ্ফল ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ পাঠাল ভগবানের কাছে।

কেবল কয়েকজনের চোখ ধক্-ধক্। নড়ব না এখান থেকে—দেখে নেব ওদের।

—কী করবে ?—যাঁরা অভিজ্ঞ তাঁরা বললেন : কী করবে দাঁড়িয়ে থেকে ?

—মারব—মরব।

—মারতে পারবে না, মরতে হবে। হাতে ওদের বন্দুক।

—আমাদেরও বল্লম আছে, ধনুক-তীর আছে।

—বন্দুকের সামনে তীর-ধনুক !—অভিজ্ঞেরা করুণভাবে হাসলেন : মিথ্যে পাগ্‌লামি করে কী লাভ ? তার চাইতে সময় থাকতে পালাও।

পালাতেই হবে। বানের মুখে দাঁড়িয়ে রোখা যায় না তাকে—লাঠি বল্লম দিয়ে ঠেকানো যায় না কালবৈশাখী ঝড়কে। পালাতেই হবে।

দাঁতে দাঁত চাপল নিরুপায়েরা।

—যদি কখনো পারি বদ্‌লা নেব এর। সেদিন কি আসবে না ?

দেখতে না দেখতে খালি হয়ে গেল গোটা গ্রামটাই। পাটকাঠির আঁটির গোটা কয়েক আলো আস্তে আস্তে অদৃশ্য হতে লাগল দূরের কালিগোলা জঙ্গলের দিকে।

শুধু দুটি প্রাণীকে কিছুতেই নড়ানো গেল না।

একজন বাসুদেব মন্দিরের কেশব গোসাঁই। মাঝারি বয়সের শান্তশিষ্ট নিরীহ মানুষটি। নির্ভীক প্রশান্ত হাসি তাঁর মুখে।

—পাগল হয়েছ, বিগ্রহ ফেলে পালাব ?

—বিগ্রহ নিয়েই পালাও তা হলে।

—দেবতাকে সরাবে মন্দির থেকে ? আমরা হার্মাদকে ভয় করি, তাই বলে দেবতাও ? ছিঃ-ছিঃ !—সংকুচিত হয়ে কেশব বললে, এ সব পাপ কথা মনেও আনতে নেই।

—তা হলে দেবতার ভাবনা তিনি নিজেই ভাবুন, তুমি চল।

—তাই কি পারি ?—কেশবের মুখে আবার শান্ত হাসি দেখা

দিল : বিগ্রহ যেখানে, আমিও সেইখানে। ঠাকুর আমার চোখের আলো, নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে আমার অজপা। আমি কি পারি বিগ্রহ ছেড়ে যেতে!

—তুমি মরবে গোসাঁই।

নিশ্চিন্ত মুখে কেশব বললে, ঠাকুর যাকে রাখেন, সে-ই থাকে। যাকে মারেন সে-ই মরে। আমরা কী করতে পারি?

মাঝরাতে মন্দিরের দরজা খুলে আলো জ্বালাল কেশব। প্রদীপের ছটায় দেবতার সর্বাঙ্গে সোনার অলঙ্কার ঝলমল করতে লাগল। ভক্ত কেশবের মনে হল, দেবতা যেন জাগ্রত হয়ে উঠেছেন এই রাতে, তাঁর দেহ থেকে ঠিকরে পড়ছে দৈবী-দীপ্তি। যুগল মূর্তির দিকে কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে কেশব ধ্যানে বসল।

আর নড়ল না রায়-বাড়ির সত্তর বছরের বুড়ীটা।

ছেলে মেয়ে, নাতি-নাতনী এক এক করে মরেছে তার চোখের সামনে। শুধু একমাত্র এই ভাঙা ভিটেয় প্রদীপ জ্বালবার জন্যে যমের ডাক এড়িয়ে বেঁচে আছে সে। পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত দু বেলা ডুকরে ডুকরে কাঁদত, এখন আর কাঁদে না। আস্তে আস্তে তার সমস্ত বোধ-শক্তিই যেন হারিয়ে ফেলেছে।

ছানি-পড়া পিচুটি মাখা চোখে কয়েক পলক তাকিয়ে রইল বুড়ী

—আমি যাব না।—তারপর ফিস্ ফিস্ করে বললে, এদের ফেলে আমি কোথায় যাব? ওই তো আমার বড় ছেলে রমেশ আর ছোট ছেলে সদানন্দ। ওই তো বৌমারা। কালু-ভুলু ওখানে মারামারি করছে। তার ওপর আমার বড় মেয়ে কমলা আজ শ্বশুর-বাড়ি যাবে। ওদের ফেলে কোথায় যাব? এত বড় সংসারের গিন্নী আমি, হাতে এত কাজ—এখন কি কোথাও যাওয়ার সময় আছে আমার? আমি কি যেতে পারি?

বুড়ীকে কেউ তুলতে পারল না—টানাটানি করেও না। খাটের একটা পায়া প্রাণপণে আঁকড়ে রইল বুড়ী—বুড়ো হাড়ে অত শক্তি কোথা থেকে পেল কে জানে, কেউ তাকে ছাড়াতে পারল না। আর্ত গলায় বুড়ী একটানা চীৎকার করতে লাগল : যাব না, এখান থেকে আমি কিছুতেই যাব না।···

···তারপর হার্মাদ।

জাহাজ কিন্তু ঘাটে ভিড়তে পারল না গ্রামের। নদীর এ-দিকটায় প্রকাণ্ড চড়া পড়ে গেছে—জল কোথাও এক হাঁটু, কোথাও এক গলা। প্রায় আধ মাইল দূরে অন্ধকার কালো জাহাজটা নোঙর ফেলল—এত দূর থেকেও শেকলের ঝন্‌ঝন্‌ কর্কশ আওয়াজ আবছাভাবে ভেসে এল। মাথার ওপরে শোনা গেল রাত-চরা পাখির তীক্ষ্ণ চীৎকার—ক্লান্ত পাখা নাড়তে নাড়তে বিবর্ণ আলোর মধ্যে কোথায় মিলিয়ে গেল পাখিটা।

এ পারে কাশবনের মধ্যে প্রতীক্ষা করতে লাগল কিশোর আর জয়রাম। অপেক্ষা করতে লাগল প্রহরীর জ্বলন্ত সজাগ চোখ মেলে।

মরা মরা জ্যোৎস্নাতেও দেখা গেল অন্ধকার জাহাজটায় শাদা শাদা কিছু মানুষের আনাগোনা। জাহাজের পুঞ্জিত ছায়ার তলায় আরো কী যেন ঘটল খানিকক্ষণ, তারপর কানে এল ঝুপ ঝুপ করে দাঁড়ের শব্দ। দুখানা ডিঙ্গি নামিয়ে দিয়ে হার্মাদেরা আসছে গ্রামের দিকে। কিশোর বললে, জয়রামদা!

—উঁ?

—আমাদের যদি বন্দুক থাকত এখন?—দাঁতে দাঁতে কড়মড় করল কিশোর : এখান থেকে এক-একটা করে—

জয়রাম বললে, চুপ, দেখাই যাক না।

পুরনো পেতলের পাতের মতো পড়ে আছে অনুজ্জ্বল জলটা। দুটো জ্বলন্ত কলঙ্ক চিহ্নের মতো এগিয়ে আসছে দুখানা ডিঙ্গি।

তর্‌তর্‌ করে চলে আসছে প্রায় পাশাপাশি। মানুষগুলোকেও আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে এখন। কুড়ি থেকে বাইশ জন হার্মাদ।

কিশোর আবার বললে, জয়রামদা!

হেমন্তের ঠাণ্ডা হাওয়ায় কাশের ফুল উড়ে যাচ্ছে ঝুর্‌ঝুরিয়ে। মুখের ওপর থেকে তার কতকগুলো সরিয়ে দিয়ে জয়রাম বললে, চুপ কর।

—কিন্তু ওরা যে এসে গেল!

—আসতে দে।

—এর পরে গ্রাম জ্বালিয়ে দেবে, সব লুঠ করে নেবে।—কিশোরের গলা কাঁপতে লাগল: আমরা সয়ে যাব জয়রামদা? আমরা কিছুই করতে পারব না?

জয়রাম সংক্ষেপে বললে, দেখা যাক।

দাঁড়ের আওয়াজ পড়ছে দ্রুত লয়ে। দুখানা ডিঙা এসে ভিড়ল নদীর ধারে। এত জোরে এসে বালির ডাঙার গায়ে লাগল যে, দু-তিনজন উল্‌টে পড়ল এ-ওর গায়ে।

কাশবনের ভেতরে দু জোড়া চোখ বাঘের মতো জ্বলতে লাগল সমানে। মাথা মুখ কাশফুলের আঁশে ছেয়ে গেছে, হাত দিয়ে সেগুলো সরিয়ে দেবার মতোও সাহস পেল না কেউ। দুটো পাথরের মূর্তির মতো পলকহীন দৃষ্টিতে দেখে যেতে লাগল।

বাইশ জন নয়—পঁচিশ জন। থপ্‌ থপ্‌ করে লাফিয়ে নামল পাড়ের ওপর। প্রায় সকলের কাঁধেই বন্দুকের কালো কালো দীর্ঘ নল—দুজনের হাতে দুখানা তলোয়ার ঝিকিয়ে উঠল পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায়। অসহ্য উত্তেজনায় নড়ে উঠে কিশোর কী বলতে যাচ্ছিল, জয়রাম মুখ চেপে ধরল তার। সাপের শিসের মতো তীব্র চাপা আওয়াজ করে বললে, এখন নয়—এখন নয়।

সার বেঁধে এক সঙ্গে অগ্রসর হল হার্মাদেরা। কিছুক্ষণের

মধ্যেই কয়েকটা সুপারীগাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। জয়রাম কানে কানে কথা কইল কিশোরের।

—নৌকোয় মোটে একজন আছে—না রে ?

—হাঁ, শুধু একজন। গাঁয়ের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

—ঠিক আছে।—জয়রাম বললে, এবার আমাদের পালা। পারবি ?

—কী করতে হবে ?

—এই কাশবনের আড়ালে আড়ালে গুঁড়ি মেরে ডিঙির আট-দশ হাতের মধ্যে পৌঁছুতে পারা যাবে না ?—কিশোর একবার সতর্ক চোখ মেলে দেখে নিলে সবটা : তা যাবে। তারপর ?

—সোজা লাফিয়ে পড়ব লোকটার ঘাড়ে।

—কিন্তু ওর হাতে বন্দুক আছে যে !

জয়রামের কালো মুখে এক ঝলক অদ্ভুত শাদা হাসি দেখা দিল : আমাদের জন্য আছে দু মুঠো নদীর বালি। পারবি ?

—পারব। অন্তত একটাকেও যদি শেষ করতে পারি জয়রাম-দা, তা হলেও খানিকটা সান্ত্বনা পাওয়া যাবে।

জয়রাম আবার সেই অদ্ভুত হাসি হাসল : দেখা যাক।

দুজনে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে চলল কাশবনের আড়ালে আড়ালে। মরা শুকনো গাছের খোঁচা লাগছে—কখনো কখনো কাঁটা বিঁধছে গায়ে। হৃৎপিণ্ডে এত জোর আওয়াজ হচ্ছে যে ভয় করছে নৌকোর ওপরের হার্মাদটাও সে শব্দ শুনতে পাচ্ছে বুঝি।

কী ভেবে হার্মাদ একবার এদিকে ফিরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে মাটির ওপর লম্বা হয়ে পড়ল দুজন। কিশোরের হাতের ওপর দিয়ে হিমের মত ঠাণ্ডা কী একটা পালিয়ে গেল—সাপই

নিশ্চয়। কিন্তু সাপের চাইতে আরও অনেক বড় শত্রু সামনে, কিশোর টেরও পেল না।

হার্মাদ বন্দুক উঁচিয়ে আবার সামনে মুখ করে বসে রইল। এখানে তার শত্রু কে আসবে—এই নিথর রাতের মাঝখানে, এই নির্জন বালির ডাঙার ওপর? যদি কিছু ঘটে, ওদিক থেকেই ঘটবে।

আবার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে শুনতে গুঁড়ি মেরে চলা। কাছে—আরও কাছে। হঠাৎ যেন বাঁ দিকে কেমন একটা সন্দেহ-জনক শব্দ শুনল হার্মাদ। চমকে মুখ ফেরাল।

কিন্তু ভালো করে কিছু দেখবার আগেই কোথা থেকে দু মুঠো ধারালো বালি এসে পড়ল তার চোখে। যন্ত্রণায় অধীর হয়ে চোখ রগড়াতে গেল হার্মাদ, আর সঙ্গে সঙ্গেই জয়রাম এসে আছড়ে পড়ল তার গায়ে—একটা লোহার মুঠি চেপে পড়ল তার গলায়। বোবা যন্ত্রণায় একটা চীৎকার করবারও সময় পেল না হার্মাদ। খানিকক্ষণ ধরে নৌকোটা যেন ঝড়ের নদীতে তুফানের দোলায় দুলতে লাগল, তারপর দুলুনি থেমে এল আস্তে আস্তে।

ততক্ষণে হার্মাদের বুক থেকে উঠে পড়েছে জয়রাম। হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। নৌকোর তলায় হার্মাদ পড়ে আছে নিথর হয়ে। বুনো—বিশৃঙ্খল চুলের তলা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে চোখ দুটো, মুখটা ফাঁক হয়ে আছে একটা হিংস্র হাসির মতো। তামাটে দাড়ির দু পাশ দিয়ে নেমে এসেছে দুটো কালো রক্তের ধারা।

কিশোর তখন কাঁপছিল। অবরুদ্ধ গলায় বললে, একটা গেল।

আরও কিছুক্ষণ দম নিলে জয়রাম। তাকিয়ে রইল হার্মাদের বীভৎস নিশ্চল শরীরটার দিকে। আস্তে আস্তে বললে, আমরা এ চাই নি—তোমরাই ডেকে এনেছ। মানুষ যখন আর মানুষ

থাকে না, তখন নিরুপায় হয়েই এ সব করতে হয়। নইলে আমরা এ চাই নি—কখনো চাই নি।

কিশোর ডাকল: জয়রামদা!

জয়রামের যেন ঘোর ভাঙল।

—অ্যাঁ?

—কী হবে এর পরে?

জয়রাম বললে, এখন এই ডিঙি দুটোকে বেয়ে নিয়ে যেতে হবে।

—কোথায়?

—বাঁ দিকের ওই বাঁকটার মুখে।

—ওখানে? ওখানে কেন?

—ভুলে গেলি?—আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে জয়রাম, আবার তার দু চোখে বন্য হিংসা দপ্ দপ্ করছে: ভুলে গেলি? ওই বাঁকের মুখেই যাতে ওরা ডিঙিতে উঠতে যায়, সেই ব্যবস্থাই তো করতে হবে।

—বুঝেছি!—আনন্দে আর উত্তেজনায় কিশোর হঠাৎ হাতে তালি দিয়ে উঠল: সেই যেখানে—

—হ্যাঁ, সেখানেই।—জয়রাম আর একবার বিবর্ণ আলোয় হার্মাদের বিকৃত মুখের দিকে তাকাল: এবার আর আমাদের হাত নোংরা করতে হবে না কিশোর। যে দেশের বুক ওরা শ্মশান করে দিচ্ছে সেই দেশের মাটিই ওদের বিচার করবে।

—ডায়ব্‌লো (শয়তান)!—হার্মাদের সর্দার গর্জন করে উঠল। কী করে আগেই টের পেয়েছে গ্রামের লোকগুলো। কোন্ দিকে কোথায় যে পালিয়েছে কে জানে! লুটতরাজের জিনিসপত্র আছে

বটে, কিন্তু একটি মেয়ে নেই কোথাও। এমন নিরামিষ শিকারে সুখ কোথায় ?

—ডায়বলো !—আবার চীৎকার করল সর্দার।

শুধু কেশব বসে ছিল নিস্পন্দ হয়ে। সামনে প্রদীপের আলোয় বিগ্রহের সোনার গয়নাগুলো ঝলমল করছে—যেন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে দেবতার। কেশব ভক্তি-রোমাঞ্চিত দেহে তন্ময় হয়ে রইল।

বাইরে গ্রাম জ্বলছে—চিৎকার উঠছে হার্মাদের। আগুনের আভায় অনেক দূর পর্যন্ত লাল হয়ে গেছে আকাশ। বাঁশ ফাটছে ফট্ ফট্ করে। গাছের ওপর থেকে আতঙ্কে জেগে উঠেছে পাখিরা—উড়তে গিয়ে যেন আবার ভিমি খেয়ে ঘুরে পড়ছে। ইতস্তত কুকুরের ডাক আসছে আর্ত কান্নার মতো।

সেই শব্দে রায়-বাড়ির বুড়ী উঠে দাঁড়াল। ছানি-পড়া চোখ মেলে কী যেন দেখতে চাইল আকুল আতঙ্কে।

—কী হল, ও সদানন্দ ? গাঁয়ে ডাকাত পড়ল নাকি ? ও পরমেশ, কী হল ?

হাত বাড়িয়ে একজন হার্মাদ ছুটে এসেছিল ক্ষুধিত নেকড়ের মতো, কিন্তু সামনে এসেই থমকে দাঁড়াল। মশালের রক্ত-মাখা আলোয় দেখতে পেল থুড়থুড়ে কদাকার বুড়ী একটা।

কদর্য একটা শপথ করে বুড়ীর বুকে প্রচণ্ড একটা লাথি বসাল হার্মাদ। যেমন করে কয়েকটা পাঁকাটি ভেঙে যায়—তেমনি করেই আট-দশটা পাঁজরার হাড় ভেঙে গেল মটমটিয়ে। মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল বুড়ী ; ক্ষিপ্ত হতাশার আরো একটা লাথি এসে পড়ল তার পিঠের ওপর।

তখনো কিছু টের পায় নি কেশব গোসাঁই—তখনো না। বিশ্বাসী কেশব জানে, ঠাকুরের হাতে সুদর্শনচক্র আছে, তিনিই রক্ষা করেন ভক্তকে। তাঁরই মন্দিরে—তাঁরই পায়ের তলায়

আশ্রয় পেয়েছে কেশব। কোনো ভাবনা নেই আর—এতটুকুও না।

কিছুই ভাবল না কেশব। মন্দিরের প্রদীপের আলোর ওপরে যখন তিন-চারটে মশালের আলো এসে আছড়ে পড়ল, যখন বিগ্রহের গায়ে সোনার অলঙ্কারের সমারোহ দেখে আট-দশ জোড়া চোখ লোভে লক্‌লকিয়ে উঠছে, তখনো কেশব এক তিল নড়ল না তার আসন থেকে। কিছুই ভাবল না। ভাববার দরকারও হল না। একটা উৎকট হাসির শব্দ বেজে উঠল পেছনে, একখানা দীর্ঘ তলোয়ার ঝলকে উঠল। কেশবের মাথাটা প্রায় দু হাত ছিটকে গিয়ে ফুলের টাটের ওপড় পড়ল, বাকি শরীর লুটিয়ে পড়ল প্রণামের ভঙ্গিতে—আর তিন-চারটে ধারায় তীরের মতো রক্ত ছুটে গিয়ে বিগ্রহকে স্নান করিয়ে দিতে লাগল।···

···ওদিকে তখনো বাঁকের মুখে ডিঙি দুখানা টেনে নিয়ে অপেক্ষা করছিল কিশোর আর জয়রাম। পুতুলের মতো চোখ মেলে দেখছিল সুপুরীবনের মাথার ওপর আগুনের শিখা দুলছে—বাতাসে শুঁকছিল পোড়া গন্ধ। সব জ্বালিয়ে, সব শেষ করে দিয়ে যাবে, একটি বাড়িও ওরা বাকি রাখবে না। একজন মেয়ে পায় নি, একটি মানুষ পায় নি হাতে—সে দুঃখ সহজে ভুলবে না ওরা। যতখানি পারে মিটিয়ে যাবে গায়ের জ্বালা।

দূরে কালো জাহাজটা ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে। কেউ আছে ওখানে—কেউ কি আছে? একটা আলো যেন মিট্ মিট্ করে জ্বলছে এক-চক্ষু দানবের মতো। চুপি চুপি সাঁতার দিয়ে গিয়ে ওই জাহাজে যদি আগুন ধরিয়ে দিতে পারা যেত—

কিশোর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

হঠাৎ পাথরের মতো স্থির মূর্তিটা নড়ে উঠল জয়রামের।

—ওরা আসছে।

—আসছে ?—কিশোরের হৃৎপিণ্ডে আবার সেই অস্থির শব্দ বাজতে লাগল দ্রুতলয়ে।

হ্যাঁ, আসছে বইকি। লুঠের বোঝা কাঁধে নিয়ে দল বেঁধে আসছে হার্মাদের দল। আসছে সেই বীভৎস প্রেতমূর্তির মিছিল। দু-তিনখানা খোলা তলোয়ার ঝিলিক দিয়ে উঠছে হেমন্তের মরা জ্যোৎস্নায়।

কিন্তু কোথায় গেল ডিঙি ? কোথায় গেল প্রহরী ?

হার্মাদেরা থেমে দাঁড়াল সবিস্ময়ে। আট-দশজন দুর্বোধ্য ভাষায় চিৎকার করে উঠল একসঙ্গে। আর তখনি দুটো মশাল জ্বলে উঠল বাঁকের মুখে। বিষণ্ণ জ্যোৎস্নায় আর সেই মশালের আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেল হার্মাদেরা। ওই তো তাদের ডিঙি। অত দূরে তাদের টেনে নিয়ে গেল কারা ? আর মশাল জ্বালিয়ে তাদের সংকেতই বা করছে কে ওখানে ?

ওরা তো প্রহরী নয় ! দুজন জেণ্টুর !

একবারের জন্যে থমকে দাঁড়াল হার্মাদেরা, তারপর চীৎকার করে ছুটল সেদিকে। কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ উঠল পর পর। মৃত হার্মাদের বন্দুক থেকে দুটো গুলি ছুঁড়ে জবাব দিলে জয়রাম।

কিন্তু আর টোটা ছিল না।

—নৌকোর ভিতর শুয়ে পড়্ কিশোর—

—তার চেয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ি জয়রামদা ?—কিশোর সভয়ে বললে।

—কিছু দরকার নেই।—জয়রাম নৌকোর পাশ দিয়ে মাথা তুলল একটুখানি : হ্যাঁ, আসছে, ঠিক রাস্তাতেই আসছে। আর একটু—আরো একটু—

হঠাৎ সোজা দাঁড়িয়ে উঠল জয়রাম, হেসে উঠল হা-হা করে।

—ফাঁদে পড়েছে কিশোর, সব কটা ফাঁদে পড়েছে। হা-হা-হা—

ফাঁদ বইকি—মৃত্যুর ফাঁদ। হার্মাদের দল তখন হুড়মুড়িয়ে নেমেছে চরের বিখ্যাত চোরাবালির ওপরে। সমস্ত ক্রোধ, সমস্ত হিংসা পরিণত হয়েছে অসহায় মৃত্যু-যন্ত্রণায়। চিৎকার, আর্তনাদে, অভিশাপে রাত্রির আকাশ কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে।

একজন বাকি নেই—একজনও না। এবার কিশোর আর জয়রাম সোজা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে উঠল নৌকোর ওপর। দেশের মাটিই এবার বিচারের ভার নিয়েছে। নির্মম—অমোঘ বিচার। মানুষের সঙ্গে সঙ্গে হাতের মশালগুলো পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে চোরাবালির অতলে। যেন মাটি তার একরাশ রক্তাক্ত জিভকে লেহন করে নিচ্ছে একবার।

সে রাত্রে একজন হার্মাদও আর জাহাজে ফিরল না।

তারপর ভোর হওয়ার আগেই জাহাজ থেকে কামান ডাকল। একবার—দুবার—তিনবার—চারবার। তবুও কেউ ফিরল না। জাহাজটা কী বুঝল কে জানে, হঠাৎ নোঙর তুলে দ্রুতগতিতে পালাতে লাগল—শঙ্খচূড়ের ফণা দেখে বুনো হাতী যেমন করে ছুটে পালায়।

পট্টমহাদেবী সুকেশা দেবী বললেন, মহারাজ, তাকিয়ে দেখুন আকাশ আজ নীলকান্ত-মণিপ্রভ বর্ণ ধারণ করেছে। মরীচিমালীর কিরণে সমগ্র ধরাতল যেন স্বর্ণাভ বলে প্রতিভাত হচ্ছে। অগণিত মধুপের গুঞ্জনে চূত-কানন উল্লসিত, মধুক্ষরণে কাননতল মদির হয়ে উঠেছে। কোকিলের কলালাপে—

শ্রীশ্রীরাজচক্রবর্তী - শক্রদমন - সসাগরামহীপাল - প্রতাপভাস্কর মহারাজ সোমগুপ্ত অর্ধপথেই রাণীর কথাটাকে থামিয়ে দিলেন। কারণ তিনি জানতেন, এই সময়েই তাঁর একটি শ্লোক উচ্চারণ আবশ্যক, কারণ এইটেই পূর্বসূরি-অনুসৃত শাস্ত্রীয় পন্থা। তিনি ভাবগর্ভ স্বরে বললেন,

দক্ষিণ পবনে আজ বিরহের অগ্নিজ্বালা বহে,
পিক-গীতি অগ্নিবাণ—নায়িকার দুঃখ নাহি সহে।

রাণী বললেন, ঠিক কথা। কারণঃ

শীতল চন্দন-পঙ্ক তপ্ত হল অনঙ্গের তাপে,
দুর্নিবার মন্মথের শরজালে সর্বতনু কাঁপে!

কবিতা-প্রতিযোগিতা আরো কতক্ষণ চলত বলা শক্ত, এমন সময় প্রাসাদের বহির্ভাগে উচ্চ-কলরোল শোনা গেল। যেন কতকগুলো শৃঙ্খলিত বন্যজন্তু সমস্বরে আর্তনাদ করে উঠল।

কোমল-হৃদয়া কিশলয়-তন্বী রাণী সে অনার্যসুলভ চীৎকারে সভয়ে শিহরিত হয়ে উঠলেন। তাঁর বক্ষোস্পন্দন রুদ্ধ হবার উপক্রম করল। তিনি ভীতা হরিণীর ন্যায় আয়তাক্ষযুগল মহারাজার মুখের ওপর নিবদ্ধ করে শৌরসেনীতে বললেন, অজ্জউত্ত, ও কিসের শব্দ!

মালবাধীশ সম্রাট সোমগুপ্ত বিরক্তিতে ভ্রূকুঞ্চন করলেন।

—কিছুই তো বুঝতে পারছি না দেবী। অনার্য শকেরা কি আবার আক্রমণ করে বসল নাকি?

রাণীর মূর্ছার উপক্রম হল। কিন্তু তবু তিনি আলংকারিক-নির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় পথ ছাড়তে পারলেন না। শ্লোক রচনা করে বলতে গেলেন:

রক্তবস্ত্র-পরিহিত খর-খড়্গ-সুশোভিত
রক্ত-আঁখি ভ্রূকুটি কুটিল—

সম্রাট সোমগুপ্ত এইবার রাণীকে একটা ধমক দিলেন। বাইরের কোলাহলটা প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হয়ে উঠছে। শঙ্কার পাণ্ডুর ছায়া ছড়িয়ে পড়ল সম্রাটের ললাটস্থ বলিরেখায়। কটিবন্ধ-সংলগ্ন তরবারির হিরণ্ময় বাঁটটি মুঠো করে চেপে ধরে তিনি হাঁক দিলেন, দৌবারিক!

গান্ধার-দেশীয় করাল-দর্শন দৌবারিক ছুটে এল।

—আদেশ, প্রভু!

—বাইরে ও কিসের কোলাহল? বর্বরের আক্রমণ?

তাম্রাভ শ্মশ্রুরাজি পরিশোভিত মুখমণ্ডলে আকর্ণ হাসি বিস্তীর্ণ করে দৌবারিক বললে, না প্রভু। ওরা নগর-উপান্তের ব্রাত্যের দল।

—কী চায়?

—ক্ষুধিত। খাদ্য চায়।

—খাদ্য?—পট্টমহাদেবী এতক্ষণ কুরঙ্গী-লাঞ্ছন নয়নে বিহ্বলভাবে লক্ষ্য করছিলেন সমস্ত ঘটনার গতিটা। বললেন, খাদ্য! বিশুদ্ধ ঘৃত-পক্ক শালিধান্য, সুস্বাদু মৃগমাংস অথবা নবনী-জারিত সুমধুর দ্রাক্ষা—এসব কি ওরা খেতে পায় না?

রাজা আবার ধমক দিয়ে উঠলেন: থামো রাণী, এ রাজনীতি—এখানে নাসিকা-প্রবেশ করিয়ো না। স্মৃতিকারেরা নির্দেশ দিয়েছেন স্ত্রী-জাতির পক্ষে উক্ত কার্য অবৈধ।

অভিমানিনী রাণী লীলাভরে মুখ ফিরিয়ে লীলাকমলের পর্ণ ছিন্ন করে ফেলতে লাগলেন। সম্রাট সোমগুপ্ত জানতে চইলেন : তারপর ?

—নগরপাল চণ্ডপ্রহার ওদের ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন। অশ্বারোহী পার্বত্য-সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়েছিলেন, ব্রাত্যেরা আহারের বদলে প্রহার লাভ করে আর্তনাদ করতে করতে চম্পট দিয়েছে।—গান্ধারী-দৌবারিকের বিশাল মুখমণ্ডলে তাম্রাভ-শ্মশ্রুর নেপথ্য থেকে আবার হাস্যরেখা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সোমগুপ্ত বললেন, সাধু, সাধু। আচ্ছা, এবারে তুমি যেতে পারো।

দৌবারিক যথোচিত অভিবাদন করে অপসৃত হচ্ছিল, সম্রাট আবার তাকে পেছন থেকে আহ্বান করলেন।

—শোনো।

—আদেশ করুন ক্ষিতিপাল।

—প্রশস্তিকার মধুকণ্ঠকে একবার আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। সত্বর।

—মুহূর্তেই আদেশ পালিত হবে।—দৌবারিক প্রস্থান করল।

গুরুতর রাজকার্য সমাপ্ত করে সম্রাট আবার প্রসন্ন সহাস্য দৃষ্টিতে মহাদেবীর দিকে তাকালেন। রমণীয় রাজোদ্যানের পরিবেশে দেবগিরির রাজকন্যার রূপমাধুরী আরো অপরূপ বলে প্রতিভাত হচ্ছে। মানিনী তখনো বিচিত্র গ্রীবাভঙ্গিসহকারে একটির পর একটি লীলাকমলের পর্ণ ছিঁড়ে চলেছেন।

সম্রাট বললে, প্রিয়ে, রাগ করলে ?

রাণী চিরাচরিত প্রথা অনুসারে রোষাগারের দিকে ধাবিতা হচ্ছিলেন, সম্রাট তাঁর হাত চেপে ধরলেন। বললেন, দেবী, শ্রবণ কর :

কুপিত আনন হেরিয়া তোমার পরাণ বিদরি যায়—
কঠিন-কঠোর কুলিশ-আঘাত যেমন গিরির গায়।

প্রশস্তিতে দেবতারা তুষ্ট হয়ে থাকেন, এ তো দেবগিরির রাজকন্যা মাত্র। রাণী ছদ্মরোষে বললেন, না।

—না? তবুও না? বলো কী চাই? বৈশালীর বৈদূর্যমণি? সিংহলের মুক্তাহার? যবদ্বীপের প্রবালাঙ্গুরীয়? বলো, কিসে পরিতুষ্টা হবে? ভামিনী, বলো কী উপায়ে মানভঞ্জন করি?

আর অভিমান করে থাকা যায় না। রাণী দেখলেন, এই উপযুক্ত সুযোগ।

বললেন, মাত্র একটি শর্তে।

—কী সে শর্ত?—যবনদেশীয় একটি পুষ্প বৃন্ত থেকে ছিঁড়তে ছিঁড়তে সম্রাট বললেন, কী তা?

—আগামী অনঙ্গোৎসবে একটি নতুন বসন্ত-বিলাস-কাব্যের দ্বারা আমার পরিতোষ-সাধন করতে হবে।

—এই কথা!—আশ্বস্ত হয়ে সোমগুপ্ত বললেন, তুমি চাইলে আমি স্বয়ং বিষ্ণুর বক্ষোবিহারী কৌস্তুভমণি আহরণ করে আনতে পারি, এ আর বেশি কী!

রাজা আরো কী বলতে যাচ্ছিলেন, প্রশস্তিকার মধুকণ্ঠ এসে অভিবাদন করে দাঁড়াল।

মধুকণ্ঠ বেতস-দণ্ডের মতো নুয়ে পড়ে লীলাভরে জিজ্ঞাসা করলে, প্রভু কী জন্যে স্মরণ করেছেন?

—অদ্যকার ঘটনা সম্যক্ অবগত আছো মধুকণ্ঠ?

মধুকণ্ঠ সবিনয়ে মস্তক বিলোড়িত করে জানাল অবগত আছে।

—প্রশস্তিতে এই ঘটনার তুমি উল্লেখ করবে তো?

মধুকণ্ঠ মধুময় স্বরে বললে, অবশ্যই।

—কী বলবে ? রাজার দৃষ্টি কঠোর হয়ে উঠল : কী ভাবে এই ঘটনাকে বিবৃত করবে তুমি ?

মধুকণ্ঠ চতুর ব্যক্তি, নিজের উপজীবিকা সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। পরম-পরাক্রান্ত মালবাধিপ সম্রাট সোমগুপ্তের মেজাজও তার অজানা নয়।

মধুকণ্ঠ দেহের আর একটি লতায়িত ভঙ্গিমা করে বললে, লিখব, দানের দিক থেকে মহারাজ সোমগুপ্ত দাতা হরিশ্চন্দ্রের ন্যায় সুমহৎ। তাঁর দ্বার থেকে ক্ষুধিত কখনো ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে যায় নি। চন্দ্র যেমন তাঁর পৌর্ণমাসীর অমল-ধবল-রশ্মিজাল নির্বিচারে বর্ষণ করে থাকেন, তদ্রূপ অমিতশক্তিধর মহারাজচক্রবর্তী সম্রাট সোমগুপ্ত দেবতা সোমের ন্যায় তাঁর কৃপা-রশ্মি বিতরণ করেন। ক্ষুধিত ব্রাত্যদের আহারদানে তিনি পরিতুষ্ট করেন, তারা তাঁর জয়গান গাইতে গাইতে ফিরে যায়।

—সাধু, সাধু। মধুকণ্ঠ, এই প্রশস্তির জন্য তোমাকে শত সুবর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করা হবে। কল্য প্রত্যুষেই কোষাধ্যক্ষকে আমি নির্দেশ দিয়ে দেব।

—সম্রাট সাক্ষাৎ করুণানিধি—

বিগলিত চিত্তে অভিবাদন জানিয়ে মধুকণ্ঠ বিদায় নিল।

রাজোদ্যানের ওপর শুক্লাচন্দ্রের অম্লান জ্যোৎস্না বর্ষিত হচ্ছে। জলযন্ত্র থেকে উৎসারিত হচ্ছে সুবাসিত জলধারা। বিবিধ পুষ্পের উন্মাদনকারী সৌরভে চারিদিক আমোদিত। কোনো একটি বিরহী পুংস্কোকিলের আর্তরবে পৃথিবী কামনাতুর হয়ে উঠছে।

স্ফটিকের আসনে সম্রাট মহাদেবীর পার্শ্বে উপবেশন করলেন।

তোরণে বাদ্যধ্বনি হচ্ছে। বিবিধ যন্ত্রের সহযোগে উঠছে বন্দীদের সংগীতালাপ। ভৈরব-মন্দির থেকে শোনা যাচ্ছে সান্ধ্য-

নীরাজনের শঙ্খ, ঘণ্টা ও মৃদঙ্গ-নির্ঘোষ—পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে উন্নতচূড় দেবালয়ের কনক-ত্রিশূল ঝলমল করছে।

ব্রাত্যদের কোলাহল আর শোনা যায় না। সমগ্র নগরীতে অপরিসীম শান্তি বিরাজিত। সম্রাট সোমগুপ্ত রঘুসূর্য রামচন্দ্রের মতো প্রজাপালন করে থাকেন, তাঁর রাজ্যে চির আনন্দ ও চির সুখের উৎসব চলে।

সম্রাট বললেন, প্রিয়ে, মধুময় বসন্ত-সন্ধ্যা সমাগত। এই মদির রাত্রিতে এতক্ষণে বিলাসিনীদের সায়াহ্ন-শৃঙ্গার সমাপ্ত হয়েছে, উজ্জ্বল বেশে-বাসে বিভূষিতা হয়ে তারা এখন প্রিয়তমদের জন্যে প্রতীক্ষা করছে। হে মৃগাক্ষি, অবধান কর ঃ

অঙ্গে ধরি নীল বাস, অধরে বিলজ্জ হাস,
কোনো নারী চলে অভিসারে,
স্পন্দিত পীবর বুক প্রিয়সঙ্গ-সমুৎসুক—

চতুর্থ চরণটি মেলাবার পূর্বেই রাণী প্রাকৃত জনের ভাষায় মাগধীতে বললেন, হয়েছে, অত সোহাগে আর কাজ নেই। আসল কথাটা চাপা দিলে চলবে না।

—কী কথা ?

—বাঃ, ইতিমধ্যেই ভুলে গেলে ? আগামী মদন-মহোৎসবে যদি নতুন কোনো বসন্ত-বিলাস-কাব্য রচিত না হয়, তা হলে পরের দিনই আমি শিবিকারোহণে পিত্রালয়ে যাত্রা করব।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। আমি আজই কবিচূড়ামণি পদ্মকোরককে ডেকে পাঠাচ্ছি। চলো, এখন ওঠা যাক, সান্ধ্যবন্দনার সময় হয়ে গেছে।

* * * *

কবিচূড়ামণি পদ্মকোরক সম্প্রতি গৃহ-সঙ্কটে কিছু বিব্রত। কিছু-দিন পূর্ব থেকেই গৃহিণী শশিকলার সঙ্গে তাঁর দাম্পত্য কলহ চলছে।

শশিকলা শাক্যদেশীয়া। তাঁর আকারে-আকৃতিতে মালিনী-মন্দাক্রান্তার বিলাস নেই, তিনি যাস্কের 'নিরুক্তে'র ন্যায় রসবোধ-বর্জিতা। পার্বত্য-দেশীয়া কন্যা বলেই সারাক্ষণ তাঁর গৃহকর্মের দিকে রুচি। শক্ত, প্রস্তরের ন্যায় তাঁর দেহ গঠন, তাঁর কঠোর মুখমণ্ডলে কোনো ভাবের অভিব্যক্তি নেই। কথা বলেন অত্যন্ত অল্প, এবং যা বলেন তা সায়নের বেদভাষ্যের মতো তীক্ষ্ণ ও কলহকণ্টকিত।

—দিনরাত ওই হস্তী-অশ্ব রচনা করে কোন্ অপক্ক-কদলী লাভ হয়ে থাকে ? ঘরে এক ফোঁটাও মধু নেই, কিছু তণ্ডুলও সংগ্রহ করতে হবে।

—দাঁড়াও, আগে বর্ষা-বর্ণনাটা শেষ করে নিই—

—বর্ষা-বর্ণনা নদীর জলে নিক্ষেপ করো। যদি গৃহকর্মের কোনো কাজে না লাগো, তবে আমিও সোজা জানিয়ে দিচ্ছি—কাল থেকে বিশুদ্ধ অরন্ধন।

উঃ, জীবন যেন দুঃসহ করে তুলল। পদ্মকোরকের মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় মালতীলতার ফাঁস গলায় পরে একদিন তিনি আত্মহত্যা করবেন। পণার্থে গোটাকয়েক স্বর্ণমুদ্রার প্রলোভনে এই মেয়েটিকে বিবাহ করে এখন তাঁর অনুতাপের অবধি নেই। বিবাহের পূর্বে রাজপুরের একজন প্রতিহারিণীর সঙ্গে রসালাপের একটি মধুর সম্বন্ধ তাঁর ছিল, কিন্তু শশিকলার সদা-সতর্ক প্রহরায় তাঁর সে পথও বন্ধ।

শুধু কি তাই ? হয়তো কোনো বিপ্রলব্ধা নায়িকার একটি মানসী মূর্তির কথা তিনি ধ্যান করছেন, এমন সময় গোময়লিপ্ত দুর্গন্ধ দেহে শশিকলা এসে দাঁড়ালেন।

—শুনছ, কিছু মুদ্গ সংগ্রহ করতে হবে যে।

—মুদ্গ !—গন্ধময় খাদ্যের নামে পদ্মকোরক উত্তেজিত হয়ে ওঠেন : আমি পারব না।

—পারবে না?—এবার শশিকলা মাতৃভাষা পৈশাচী প্রাকৃতে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন: তবে সোহাগ করে বিয়ে করতে গিয়েছিলে কেন দগ্ধানন? রজ্জু আর কলসী কি জোটে নি?

পৈশাচী প্রাকৃতের দুঃসহ বাক্যবাণে কান চেপে ধরেন পদ্মকোরক।

শুধু ওখানে শেষ হলেও কথা ছিল। শশিকলা সর্বশেষে যা করে বসেছেন, তাতে কবিধুরন্ধর পদ্মকোরকের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেছে।

মাধবী, যূথী, মল্লিকা, কিংশুক, কুরুবক, মালতী-লতা ইত্যাদি দিয়ে গৃহ-প্রাঙ্গণে একটি মনোরম কুঞ্জ রচনা করেছিলেন পদ্মকোরক। সেখানে বসেই তিনি তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর শ্লোকরাজি রচনা করতেন তিনি। একদিন প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গের পরে তিনি যা দেখলেন, তাতে তাঁর মাথায় বজ্রাঘাত হল। দেখলেন, তাঁর অমন মনোরম কুঞ্জবন যেন মত্তহস্তী দ্বারা বিদলিত। ছিন্নমূল আর কর্তিত-কাণ্ড পুষ্পবৃক্ষগুলি মৃতা নায়িকাদের দেহের মতো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

পদ্মকোরক আর্তনাদ করে উঠলেন: সর্বনাশ, এ কী করে হল!

শশিকলা গৃহমার্জনী হাতে বেরিয়ে এলেন। বললেন, অনার্যের মতো চীৎকার কোরো না—লোকে অনডান্ ভাববে। আমি করিয়েছি।

—তুমি!—বুকে হাত দিয়ে বসে পড়লেন পদ্মকোরক।

—হ্যাঁ, আমি।—শাক্যদেশীয় শিলাখণ্ডের মতোই কঠোর শোনাল শশিকলার কণ্ঠ: ও সমস্ত ভস্ম দিয়ে কী হবে? বিপণিতে তরি-তরকারির যা মূল্য বেড়েছে, তাতে আর সংসার চালানো সম্ভব নয়। তাই ওখানে প্রয়োজনীয় বৃক্ষাদি রোপণ করা হবে।

বিহ্বল চোখে পদ্মকোরক তাকিয়ে রইলেন।

—ওখানে কুষ্মাণ্ড লাগাব, অলাবু লাগাব। লশুনও ভালোই হবে। তা ছাড়া মাটি নানাজাতীয় কন্দেরও উপযোগী, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ওল এবং নালিতা-শাক হবে—

—হা হতোঽস্মি!—পদ্মকোরক বাণবিদ্ধ চক্রবাকের মতো পথে বেরিয়ে পড়লেন। শুধু বেরিয়ে পড়লেন না, উত্তপ্ত ধান্য বিদীর্ণ করে ছিটকে-পড়া লাজের মতোই ছুটে গেলেন তিনি।

কিছুক্ষণ রাজপথে চলতে চলতে মুক্ত বাতাসে এবং নগর-বিলাসিনীদের কটাক্ষ প্রক্ষেপে যখন শরীর কিঞ্চিৎ শান্ত হল, তখন পদ্মকোরক কিছু মাধ্বী-সেবনের আকাঙ্ক্ষা বোধ করলেন। শৌণ্ডিকালয়ের দিকে মন্দ পদে এগোচ্ছেন, এমন সময় রাজদূত এসে অভিবাদন করল।

—কী সংবাদ ধূম্রবর্ণ?

—আপনার আলয়েই যাচ্ছিলাম ভদ্র। পরমভট্টারক সর্বলোকপাল সসাগরা-মহীশ্বর শ্রী শ্রী শ্রী—

পদ্মকোরক জানতেন, সমস্ত উপাধিগুলো উচ্চারণ করতে দূতের দণ্ডকাল ব্যয়িত হবে। অতএব বাধা দিয়ে বললেন, বুঝেছি। সম্রাট বুঝি স্মরণ করেছেন?

—হাঁ, ভদ্র। সেই দেবতাদের অনুগ্রহধন্য, মহারুদ্র ভৈরবের আশ্রিত, শত্রুর হৃৎকম্প-উৎপাদনকারী—

পদ্মকোরক আবার বাধা দিলেন: থাক্, থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। চলো এখন।

সম্রাট বললেন, পট্টমহাদেবীর নির্দেশ। আগামী দিবসত্রয় পরে মদন-মহোৎসব, এর মধ্যেই কাব্যটি সমাপ্ত হওয়া চাই।

পদ্মকোরক নত মস্তকে পদনখের অগ্রভাবে মৃত্তিকা চিহ্নিত করতে লাগলেন, উত্তর দিলেন না।

সম্রাট সোমগুপ্ত বললেন, কী ভাবছ এত ?

পদ্মকোরক সবিনয়ে বললেন, নিবেদন করতে আশঙ্কা হচ্ছে।

—কিসের আশঙ্কা ? নির্ভয়ে বলো।—সম্রাট অধৈর্যভাবে পাদপীঠে রত্নমণ্ডিত পাদুকা মৃদু প্রহার করলেন।

—এই বলছিলাম—পদ্মকোরক একবার ঢোঁক গিললেন: উপযুক্ত কাব্য রচনা করতে তদনুযায়ী একটি পরিবেশ প্রয়োজন। প্রকৃতিক শোভা ও নির্জনতা না থাকলে—কবি চূড়ামণি থামলেন।

—বলে যাও।—সম্রাটের মুখে হাস্যরেখা বিকীর্ণ হল।

—বলছিলাম, মানে এই বলছিলাম, সম্রাট যদি আমাকে এইরকম একটি উদ্যান-গৃহ রচনা করে দেন, তা হলে সেখানে বসে দিবসত্রয় কেন, ত্রিদণ্ডের মধ্যেই আমি অপূর্ব রসকাব্য রচনা করে দিতে পারি।

—সে রকম স্থান তোমার সন্ধানে আছে ?

—আছে বই কি মহারাজ। নদীতীরে চম্পাবনের মধ্যে।

—বেশ।—সম্রাট মহামাত্যের দিকে তাকালেন: আজই লোক নিযুক্ত করো। কাল দ্বিপ্রহরের মধ্যে নদীতীরের চম্পাবনে কবি পদ্মকোরকের জন্যে উদ্যানাগার নির্মাণ করতে হবে।

সহ-মহামাত্য উঠে দাঁড়ালেন।

—প্রভু, ওখানে যে শবরদের বাস—

—তাদের বিতাড়িত করো—

—আজ্ঞে, পুরুষানুক্রমে তারা ওখানে বসবাস করছে, আজ নিরাশ্রয় করে দিলে কোথায় যাবে তারা ?

সম্রাট মুহূর্তের জন্যে দ্বিধা করলেন, কিন্তু গর্জে উঠলেন নগরপাল চণ্ডপ্রহার।

—অত দুর্বল হৃদয় নিয়ে রাজকার্য চলে না সহ-মহামাত্য ইন্দ্রদেব। বলে, যাবে কোথায় ? যাবে চুল্লীতে। যদি আপত্তি

করে, আমার ভল্ল আছে, শূল আছে, তরবারি আছে। পট্টমহাদেবীর বাসনা অপূর্ণ থাকবে না।

—সাধু, সাধু নগরপাল—

করতালিধ্বনিতে সভাগৃহ মুখরিত হল। সহকারী মহামাত্য আরো কিছু বলতে চাইলেন, কিন্তু বলতে পারলেন না, চণ্ডপ্রহারের অসির ঝঞ্ঝনায় তা তলিয়ে গেল।

* * *

আমি ইতিহাসের ছাত্র। যে প্রাচীন পুঁথি থেকে তথ্যটি জোগাড় করেছিলাম, সেটি এইখানেই খণ্ডিত, বাকি পাতাগুলো আর পাই নি।

তবে বসন্ত-বিলাস-কাব্যমের কথা জানি। প্রাচীন কাব্যগুলির মধ্যে এর একটা বিশিষ্ট মর্যাদা আছে, পট্টমহাদেবী পরিতুষ্টা হয়েছিলেন সন্দেহ নেই।

সম্রাট সোমগুপ্তের রাজমহিমা, তাঁর রামচন্দ্রের মতো প্রজা-পালনের কথা, তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্যের কথা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। মালবের গৌরব-বর্ধন করেছিলেন তিনি।

আর একটি প্রশস্তি পাওয়া গেছে, একখণ্ড শিলাফলকে উৎকীর্ণ। কিছুটা ভাঙা বলে রচয়িতার নাম সম্পূর্ণ পড়া যায় নি, শুধু আছে 'ধু' আর 'ণ্ঠ'। মধুকণ্ঠ খুব সম্ভব।

সে প্রশস্তিতে একটা নতুন খবর আছে। তা এই :

'একবার সম্রাট সোমগুপ্তের রাজ্যের শবরেরা বিদ্রোহ করে। তারা সম্ভবত রাজ-সিংহাসন অধিকার করতে চেয়েছিল। কিন্তু কৃতান্তের ন্যায় পরাক্রান্ত সম্রাটের দুর্জয় সৈন্যবাহিনী তাদের বিধ্বস্ত করে দেয়, মনঃশিলায় রঞ্জিত অঞ্জন-শিলার ন্যায় শবরদের কৃষ্ণকায় রক্তাক্ত মৃতদেহ ছড়িয়ে থাকে চম্পাবনের মধ্যে, তাদের রক্তে নদীর নীলজল লোহিতরাগ ধারণ করে"—

কাগজপত্রগুলো সরিয়ে দিয়ে আমি 'বসন্ত-বিলাস-কাব্যমে' মনোনিবেশ করলাম। সত্যিই চমৎকার রচনা—সার্থক রসকাব্য!

"প্রিয়ার অধরে বিদ্রুম-দ্যুতি
আয়ত নয়ন নীলোৎপল,
মরাল-নিন্দ চরণছন্দ
কামীর চিত্ত রসোচ্ছল—"

ভাটিয়ালী

মা বারান্দায় বসে তকলি কাটছিলেন। নিমগাছটার ওপারে চাঁদ উঠেছে। ঝিলমিল করে ছায়া কাঁপছে উঠোনে। নদীটাকে এখান থেকে দেখা যায় না, কিন্তু ভাটিয়ালী গানের এক-একটু টুকরো হাওয়ায় ভেঙে ভেঙে পড়ছে। একবারের জন্যে মার মনে হল, গানটা তাঁর চেনা। কিন্তু সব ভাটিয়ালী গানের সুরই তো একরকম—রাতের হাওয়া, আকাশ আর নদীর জলের সঙ্গে এক তানে বাঁধা। কথার বদল হয় বার বার, সুরটা চিরকালের।

মার বয়েস ষাটের কাছাকাছি। জীবনের প্রায় পঞ্চাশটা বছর চোখ বুজলেই দেখতে পান। এগার বছর বয়সে যে-দেশ থেকে এ-ঘরে তিনি এসেছিলেন, সে-দেশে নদী ছিল না। ট্রেন থেকে নেমে নৌকো করে আসবার সময় প্রথম তিনি ভাটিয়ালী গান শুনেছিলেন। অর্থ বুঝতে পারেন নি, তবু বুকের ভিতরে এক রাশ কান্না এসে ভেঙে পড়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল, তাঁদের বাড়ির ডালিম গাছটা রাঙা ফুলে ফুলে ছেয়ে গেছে, দুটো বুলবুলি দুষ্টুমি করে বেড়াচ্ছে ডালে-ডালে। আরো মনে পড়েছিল, তাঁর পালকিটা যখন ছাতিমতলার বাঁক ঘুরছে, তখনো ডালিম-গাছটার সামনে তাঁর বাবা পাথরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন। একমাত্র মেয়ে তিনি—ছেলেবেলা থেকেই মা ছিল না।

তারপর তাঁর অনেক কান্না, অনেক ব্যথার সঙ্গে ওই ভাটিয়ালী গান জড়িয়ে রয়েছে। সেই প্রথম দিন যখন ও-গান তিনি শুনেছিলেন, সেদিন নদী ছিল অন্ধকার। কে গাইছিল, কোথা থেকেই বা গাইছিল, মা দেখতে পান নি। মনে হচ্ছিল, রাত্রির নদীটাই বুঝি ঢেউয়ে ঢেউয়ে তাল দিয়ে একটা অশরীরী গান দিকে দিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সেই থেকে ও-গান কতবার তিনি শুনেছেন, যেন

ওর সুর কণায় কণায় ঝরে পড়েছে আকাশ থেকে, রাতের হাওয়া থেকে, নদীর জল থেকে, জ্যোৎস্নায় ঝিলমিল নিমের পাতা থেকে।

মা অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন, চমকে উঠে দেখলেন, তকলির সুতো কেটে গেছে।

আবার সুতো জোড়া দিতে গেলেন, কিন্তু উৎসাহ পেলেন না। অন্তত পঞ্চাশ জোড়া পৈতে জমা হয়েছে ঘরে। কিন্তু কার জন্যে ? কে পরবে পৈতে ? পাকিস্তান হওয়ার পরে ফাঁকা হয়ে গেছে গ্রাম—দু-চার ঘর যে বসতি আছে, তা থেকে কালে-ভদ্রে কেউ এক-আধটা পৈতে নিতে আসে। চণ্ডীমণ্ডপগুলো সব ধসে পড়ছে, পূজো আর হয় না। অবস্থাপন্নদের মধ্যে শুধু সেন-বাড়ির এক ঘর শরিক এখনো জমি জায়গা আঁকড়ে পড়ে আছে, তাদের বাড়িতেই কেবল নিয়মরক্ষার মত দুর্গোৎসব হয়। ওরাই পাঁচ-সাত জোড়া পৈতে নিয়ে যায় সে-সময়।

তবু মা পৈতে কেটে চলেছেন। ত্রিশ বছরের অভ্যাসেই কেটে চলেছেন। এক সময় সারা গাঁ-কে তাঁর পৈতের যোগান দিতে হত, এমন মিহি হাত আর কারো ছিল না। সে-হাত ষাটের কাছাকাছি এসেও তেমনিই আছে, জোড়ার পর জোড়া পৈতে জমছে ঘরে ; কিন্তু নেবার লোক আজ আর নেই।

একবার ভেবেছিলেন, কলকাতায় বড় ছেলেকে কিছু পাঠিয়ে দেবেন। কিন্তু তারা এ-সব মানে না। বড় নাতির বয়েস পনের পেরিয়ে গেল, কিন্তু এখনো উপনয়ন হয় নি। গত বছর দিন সাতেকের জন্য বড় ছেলে সুশান্ত যখন দেশে এসেছিল তখন মা একবার তুলেও ছিলেন কথাটা।

কিন্তু সুশান্ত কোনো কথা বলবার আগেই জবাবটা দিয়েছিল এম. এ.-পাস বউমা কণিকা।

"কী হবে মা ও-সব করে? কিছুই তো মানে না। দুদিন পরেই ফেলে দেবে ছিঁড়ে। কী দরকার ও-সবের?"

"তবু ব্রাহ্মণের একটা সংস্কার—"

কণিকা চাপা হাসি হেসেছিল একটুখানি। বলেছিল, "সপ্তাহে যে-বাড়িতে তিন দিন মুরগী আসে মা, যে-বাড়ির ত্রিসীমানায় পঞ্জিকার বালাই নেই, সেখানে ও-সমস্ত সংস্কার না মানলেও কোন ক্ষতি হবে না। তা ছাড়া ধর্ম জিনিসটা—"

ধর্ম জিনিসটা আসলে যে বাইরের নয়, এ সম্বন্ধে ছোট একটা বক্তৃতা দিয়েছিল কণিকা। মা সেগুলো ভালো করে শুনতে পান নি। শুধু দেখেছিলেন, হাতের চায়ের পেয়ালাটা ভুলে গিয়ে সুশান্ত মুগ্ধ চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

মা রাগ করেন নি, দুঃখও পান নি। যখনকার যা নিয়ম। পঞ্চাশ বছর ধরে এই বাড়িতেই কি কম অদল-বদল হয়েছে? দক্ষিণের ঘরের শরিকেরা তো চোখের সামনেই মরে গেল একে একে। পূবের ঘর সেই যে বিশ বছর আগে দেশ ছাড়ল, তারপর তাদের একজনও একদিনের জন্যে এ-বাড়িতে ফিরে এল না। সুশান্তর অন্নপ্রাশনের দিন দক্ষিণের ঘরের কাকিমা একা তিন শো লোকের রান্না সামলেছিলেন, মরবার আগে এক ঘটি জল গড়িয়ে খাওয়ার সামর্থ্য ছিল না—এমনি অথর্ব হয়ে গিয়েছিলেন তিনি আর মা নিজে? টকটকে লাল চওড়া পাড়ের শাড়ি পরতেন, কপালে মস্ত করে দিতেন সিঁদুরের ফোঁটা—

সব বদলে গেছে, সব অন্য রকম। উপনয়নের এগারো দিন পরে যে সুশান্ত দণ্ড ভেঙে ঘাট থেকে ব্রহ্মণ্যদেবের মত উঠে এসেছিল, যার মুখের দিকে চেয়ে মা মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, সে-সুশান্ত আজ ধুতি-পাঞ্জাবি পরতেও ভুলে গেছে। যখনকার যা নিয়ম।

শুধু ছোট ছেলেটা—

শহরের কলেজে বি. এস-সি. পড়তে পড়তে স্বদেশিতে ঢুকল। তিন বছর জেল খাটল একবার। জেল থেকে বেরিয়ে সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হল, আজ সাত বছর তার আর কোনো খবর নেই। সত্যি, সবই বদলায়। বাইরে একটুখানি ঝোড়ো হাওয়া বইলে কিংবা আকাশে এক-আধবার মেঘ ডাকলে যে-অশোক মায়ের বুকের ভিতর মুখ লুকিয়ে থাকত, সে যে এমন করে এ-পথে পা দিয়ে অন্ধকারে ভেসে যাবে, তা-ই বা কে ভাবতে পারত!

ভাটিয়ালী গানটা আর শোনা যায় না। একটু একটু করে ক্ষীণ হতে হতে একেবারে মিলিয়ে গেছে। উঠোনে ঝিলমিল করছে নিমের ছায়া। মা আবার তকলি তুললেন। পুরনো পাঁজ ফেলে দিয়ে নতুন তুলে নিলেন একটা।

পৈতে কাটতে হবে। চল্লিশ বছর আগে প্রথম শিখেছিলেন, সেই থেকে সমানে কেটে আসছেন। কখনো মাটির প্রদীপের কাঁপা-কাঁপা আলোয়; কখনো ঝক্‌ঝকে লণ্ঠনের চক্‌চকে আলোতে; কখনো কখনো পূর্ণিমার চাঁদ উঠলে তাতেই কুলিয়ে গেছে। কত ভাটিয়ালীর গান উঠেছে, কত ছায়া দুলেছে উঠোনে, কত আকাশ-ভাঙা বাদলায় টুপ টাপ করে টিনের চাল চোঁয়ানো জল দু-চার ফোঁটা ঝরে পড়েছে আশে পাশে। আর মা তকলি কেটেছেন। হাতের সুতো দিনের পর দিন মিহি হয়েছে, সরু আর উজ্জ্বল হয়েছে মাকড়শার জালের মতো—আর সেই সঙ্গে পার হয়েছে কত মাস, কত বছর, কত কাল।

মার পৈতে জমে উঠেছে। বিয়ের সময় যে ছোট টিনের হাত-বাক্সটা পেয়েছিলেন তার অর্ধেকটা ভরে উঠেছে প্রায়। কে নেবে? কাকে দেবেন? মা জানেন না। মাথার চুলগুলো প্রায় সব পেকে গেছে। এর পরে একেবারে শনের নুড়ির মত সাদা হয়ে যাবে,

দক্ষিণের ঘরের কাকিমার মত একেবারে অথর্ব হয়ে পড়বেন, এক ঘটি জল গড়িয়ে খাওয়ার সামর্থ্যও থাকবে না, তবু তখনো কাঁপা হাতে মাকে পৈতে কাটতে হবে।

কার জন্যে? জানেন না। শুধু এইটুকু জানেন, এ ছাড়া তাঁর হাতে আর কোনো কাজ নেই। তিনি অপেক্ষা করে আছেন। কে আসবে? সুশান্ত? অশোক? মা জানেন না।

কিন্তু সুধা এল।

"জেঠাইমা!"

মা ফিরে তাকালেন। সেন-বাড়ির গৃহদেবতার পুরুত শশী ভট্টাচার্যের বড় মেয়ে। ভারি গরিব শশী ঠাকুর। পাকিস্তান হওয়ার আগে পেট ভরে খেতে পেত না, এখন আধপেটা খায়। তবু দেশ ছেড়ে যায় নি। তার পক্ষে সবই সমান। রুগ্ন স্ত্রী আর তিনটি মেয়ে নিয়ে কোনোমতে বেঁচে থাকার যুদ্ধে আশ্চর্যভাবে টিঁকে রয়েছে লোকটা। মার বাড়ির ঠিক পিছনেই ওদের ঘর—ওদের রান্নাঘরে ধোঁয়া না দেখলে প্রায়ই এক-আধ সের চাল সুধাকে ডেকে আঁচলে ঢেলে দেন মা।

"রান্নাবান্না হয়ে গেছে তোর?"—মা জানতে চাইলেন।

সুধা হাতের 'মনসামঙ্গল'খানা পাশে রেখে মাদুরে এসে বসল মার মুখোমুখি।

"ও-বেলার সবই ছিল, শুধু দুটো ভাত ফুটিয়ে এলাম।" সুধা মার হাতের তকলিটার দিকে তাকাল: "আপনার এ-বারের পৈতে কিন্তু আগের চাইতে মোটা হচ্ছে জেঠাইমা।"

মা তকলিটা গুটিয়ে পাথরের বাটিতে নামিয়ে রাখলেন: "তুলো ভালো নয় আজকালকার। তা ছাড়া পৈতেই বা পরছে কে এখন, সরু-মোটাই বা কে দেখছে!" একটা চাপা নিশ্বাস সামলে নিয়ে বললেন, "তোর মা কেমন আছে আজকে?"

উঠোনের উপর নিমের কাঁপন-লাগা ছায়ার দিকে একবার তাকিয়ে দেখল সুধা। আস্তে আস্তে বললে, "মার আর থাকা! আজ বিকেলেই আবার জ্বর এসেছে।"

একটা শান্ত বিষণ্ণতায় কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ করে রইলেন। শিরশির করে বাতাস বইছে। ঝিঁঝির ডাক উঠেছে পিছনের সুপুরি-বাগানে।

'মনসামঙ্গল' তুলে দিয়ে সুধা বললে, "পড়ি?"

"পড়।"

সুধা পাতা ওলটাতে শুরু করল: "আজ কোথা থেকে আরম্ভ করব জেঠাইমা?"

"স্বপ্ন-অধ্যায় থেকে।"

সুধা জায়গাটা খুঁজে পেয়েছিল। পড়ার আগে বইখানা একবার মাথায় ঠেকিয়ে নিলে। তারপরেই হাওয়ার শব্দ আর ঝিঁঝির ডাক ছাপিয়ে তার সুরেলা গলা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

মা শুনতে লাগলেন, কিন্তু বইয়ের দিকে তাঁর মন ছিল না। আজ এই মুহূর্তে এই সুধা মেয়েটার জন্যে একটা গভীর করুণায় তাঁর মন ভরে উঠেছে। ষোল-সতের বছরের শ্যামশ্রী মেয়ে। পেট ভরে দু-মুঠো ভাত জোটে না, তবু আশ্চর্য ঢলঢলে মুখখানি; গিঁট দিয়ে ছেঁড়া কাপড় পরে, তা সত্ত্বেও মনে হয় সারা গা থেকে লক্ষ্মীশ্রী ঠিকরে পড়ছে ওর। একটা ভালো ঘরে-বরে মেয়েটা যদি পড়ত—তা হলে উজ্জ্বল করে তুলত সংসার। কিন্তু বিয়ে দেবার পয়সা কই শশী ঠাকুরের? বিশেষ করে পাকিস্তান হওয়ার পর সমস্যাটা আরো জটিল হয়ে উঠেছে।

সত্যি মায়া হয় মেয়েটার জন্যে। ভারি মায়া হয়।

কোথায় দু-তিনটে কুকুর এক সঙ্গে চিৎকার জুড়ল, মা চমকে

উঠলেন। সুরেলা গলার ঢেউ তুলে পড়ে চলেছে সুধা। মা কান পেতে শুনতে লাগলেন ঃ

"গা তোলো আরে পুত্র কত নিদ্রা যাও।
শিয়রে মনসা তোমার চক্ষু মেলি চাও॥
মনে ভয় না করিও দেখিয়া নাগ জাতি।
মহাদেবের কন্যা আমি নাম পদ্মাবতী॥—"

মা আবার স্মৃতির মধ্যে ফিরে এলেন। পনের বছর আগেকার কথা—অশোকের সেবার সান্নিপাতিক জ্বর হয়েছিল। বাঁচবার আশাই ছিল না, তবু দু মাস বাদে যমের মুখ থেকে ফিরল অশোক। সেই উপলক্ষে স্বামী ঘটা করে মনসার 'রয়ানী'র ব্যবস্থা করেছিলেন। দু রাত গান হয়েছিল। অমন চমৎকার 'রয়ানী' মা এর আগে আর কখনো শোনেন নি। পরেও না।

সুধা বইয়ের পাতা ওলটাল। কাগজের খচখচ শব্দে মা আবার সচেতন হয়ে উঠলেন। সুধা পড়ে চলেছে ঃ

"মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি দত্ত॥
হরি দত্তের যত গীত লুপ্ত পাইল কালে।
জোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥
কথার সঙ্গতি নাই—নাইকো সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাই মিত্রাক্ষর—"

"মা!"

সুধার হাতে 'মনসামঙ্গল' কেঁপে উঠল, যেন একটা তীর এসে বিঁধল মার বুকে। দুজনের চোখ এক সঙ্গে গিয়ে উঠোনের ওপর পড়ল।

আবার ডাক এল, "মা!"

মা দাঁড়িয়ে উঠলেন। অস্বাভাবিক গলায় বললেন, "কে—কে ?"

"চিনতে পারছ না আমায় ? আমি অশোক।"

"অশোক !" মার মনে হল স্বপ্ন দেখছেন। আর স্বপ্নটা এই মুহূর্তেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু স্বপ্ন নয়—সত্যিই অশোক। 'মনসামঙ্গল'এর তন্ময়তার অবসরে কখন যে সে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে কেউ তা দেখতে পান নি। গ্রামের কুকুরগুলো নির্জন পথে এতক্ষণ যে তাকেই অভ্যর্থনা করছিল, তাও বুঝতে পারেন নি মা। তারপরেও প্রায় মিনিটখানেক ধরে সে যে নিমের ঝিলমিলে ছায়ার তলায় চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, সেটাও মার চোখে পড়ে নি।

মার ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগল এবার। বিড়বিড় করে বললেন, "অশোক !"

হাতের সুটকেসটা উঠোনে ফেলে রেখে ছুটে এল অশোক। এক লাফে বারান্দায় উঠে প্রণাম করতে গেল মাকে। মা দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন তাকে।

তারও পরে অনেকক্ষণ ধরে অশোকের চোখের জলে মার বুক ভেসে যেতে লাগল, আর মার চোখের জল শান্তিজলের মত টপটপ করে পড়তে লাগল অশোকের মাথার উপর। সুধা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। উঠোনের উপর চতুর্দশীর চাঁদের আলো মেখে নিমের ছায়া ঝিলমিল করতে লাগল।

প্রায় দশ মিনিট পরে মা স্বাভাবিক হয়ে এলেন। বসে পড়লেন মাদুরের উপর। অশোক বসল পায়ের কাছে।

আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে মা বললেন, "এতদিন ছিলি কোথায় ? সেই স্বদেশি নিয়ে নাকি ?"

অশোক হাসল : "স্বদেশি একটু ছিলই মা—সে মারাত্মক কিছু নয়। আসলে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম।"

"একখানা চিঠিও কি লিখতে নেই রে ?"

"প্রায়ই তো ভাবতাম—দু-চার দিনের মধ্যেই ফিরে আসব। কিন্তু ফিরে আসাও হত না—চিঠিও লেখা হত না।"

"এখন কী করবি আবার ?" মার মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হয়ে গেল, "আবার পালিয়ে যাবি নাকি ?"

"না মা, তোমাকে ছেড়ে আর পালাব না। ভেবেছি দেশেই থাকব। তোমার কাছেই।"

"কিন্তু দেশ যে পাকিস্তান হয়ে গেছে !"

"দেশের নাম নয় বদলেছে, কিন্তু সাত-পুরুষের ভিটে তো আর বদলায় নি মা। তা ছাড়া এও ভেবে দেখলাম, সবাই যখন দেশ ছেড়ে চলে গেছে, তখন দেশে থাকাটা আমার একান্তই দরকার।" একটু থেমে অশোক বললে, "আচ্ছা মা, বড়দা তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চায় নি ?"

মা চুপ করে রইলেন একটুখানি। নিতে চেয়েছিল বইকি সুশান্ত। বার বার। কিন্তু—

কিন্তু ও-বাড়িতে কেউ পৈতে পরে না। ধুতি পাঞ্জাবি ব্যবহার করতেও ভুলে গেছে সুশান্ত। তা ছাড়া এই বাড়িতে প্রায় পঞ্চাশ বছরের জীবন, উঠোনের ওই তুলসীতলায় স্বামীর মুখে কয়েক ফোঁটা গঙ্গাজল দেওয়া শেষবারের জন্যে, কত নিরালা সন্ধ্যেয় দূরের নদী থেকে অদেখা মাঝির ভাটিয়াল গান—

উত্তরটা অশোকই দিলে। কী ভাবল কে জানে, বললে, "না গিয়ে ভালোই করেছ মা। তুমি চলে গেলে মাতৃভূমিও চলে যেত এখান থেকে। ভালোই করেছ।"

"অশোকদা, আপনাকে একটা প্রণাম করব।"

দুজনেই চকিত হয়ে উঠলেন। সুধা। এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ছায়ার মত।

তাড়াতাড়ি মা বললেন, "করবি বইকি—নিশ্চয়ই করবি।"

অশোক তাকিয়ে দেখল সুধার দিকে। বারান্দায় ঝকঝকে লণ্ঠনের চকচকে আলো। নিম গাছের ফাঁকে চতুর্দশীর চাঁদ। একটি মেয়ে নয়—ঘরের আর বাইরের আলো মিশে গিয়ে এমনভাবে রঙ ফলিয়েছে তার উপর যে, তাকে একখানা ছবির মতো মনে হচ্ছে। নিরাভরণ শরীর—শুধু দু হাতে কয়েকগাছা লাল কাচের চুড়ি। ময়লা ডুরে শাড়ির আঁচল কাঁধের উপর অনেকখানি ছেঁড়া, সেটুকুও অশোকের চোখ এড়াল না।

সুধা নুয়ে পড়ে প্রণাম করল অশোকের পায়ে। একরাশ রুক্ষ চুলের এক ঝলক গন্ধ পেল অশোক।

"কিন্তু এ কে মা? একে তো চিনতে পারলাম না।"

"ও যে শশীঠাকুরপোর মেয়ে সুধা।"

"সুধা! এত বড় হয়ে গেছে!"

"হবে না? সাত-আট বছরের ভিতরে তুই তো দেশে আসিস নি।"

সাত আট বছর। তা বটে। একেবারে যুগ-যুগান্তর। দাঙ্গা, পার্টিশন। তারই ভিতরে ভাঙা বেড়ার আড়ালে বুনো লতার মত বেড়ে উঠেছে সুধা। কিন্তু ছাইগাদার মধ্যে থেকে জীবনের রস পায় নি—শুকনো পাতা, ম্লান মঞ্জরী। তবু উজ্জ্বল তারুণ্যের সূর্য-স্বপ্নে টলটল করছে মুখখানি।

"সেই সুধা?" অশোক হাসল: "সারা দুপুর ঘুরে ঘুরে বৈঁচি খেত আর টক টক করমচা? বেরালছানার গলায় দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে বেড়াত?"

ঘর আর বাইরের আলোতে চোখে পড়ল, সুধার ছবির মতো মুখের উপরে রঙ বদলাচ্ছে। স্নিগ্ধ গলায় মা বললেন, "এখন ভারি ভালো মেয়ে হয়েছে—ভারি লক্ষ্মী মেয়ে। না রে সুধা?"

সুধা জবাব দিল না। মুখের রঙ বদলাতে লাগল তার।

মা বললেন, "ও-সব কথা পরে হবে। এখন তোর জন্যে তো খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। আমি উঠি—"

অশোক বললে, "তুমি কেন মা? বাড়িতে আর লোকজন নেই নাকি?"

মা বললেন, "থাকবে না কেন? যোগেন দাসের বউই তো আমার দেখাশোনা করে। কিন্তু সে গেছে কাল মেয়ের বাড়ি, তার জামাইয়ের অসুখ, তাকে দেখতে। আমিই উনুনটা ধরিয়ে চালে-ডালে একটুখানি ফুটিয়ে দিই তোকে। মাছ-টাছ তো আজ ঘরে নেই—"

"মাছের কোনো দরকার নেই মা।" অশোক উৎসাহিত হয়ে উঠল: "একটু মুগের ডালের খিচুড়ি, দুটো আলুসেদ্ধ, ব্যাস—অমৃত!"

মা উঠোনে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন। বাধা দিলে সুধা।

মৃদু গলায় বললে, "আপনি কেন কষ্ট করবেন জেঠাইমা? আমিই করে দিচ্ছি।"

"তোর রাত হয়ে যাবে না মা?"

"রাত কেন হবে? বেশীক্ষণ তো লাগবে না।

মা হাসলেন, "বেশ, তা হলে তোর অশোকদাকে আজ তুই-ই রান্না করে খাওয়া।"

সুধা নেমে গে৷

মা ডেকে বললেন, "দেশলাই কোথায় আছে জানিস তো? আর চাল-ডাল?"

সুধা ঘাড় ফিরিয়ে হাসল। সে জানে।

রান্নাঘরের শিকল খুলে সুধা ভিতরে ঢুকল। দেশলাইয়ের আওয়াজ উঠল—জ্বলল কেরোসিনের ঢেবি, লালচে আলোয় ভরে উঠল রান্নাঘর।

অশোক তাকিয়েছিল সে-দিকেই। এবার মুখ ফিরিয়ে জানতে চাইল : "ও রাঁধতে পারে ?"

অশোকের বিশৃঙ্খল চুলে আঙুল বুলোতে বুলোতে মা বললেন, "তুই কি বিলেত থেকে ফিরলি রে ? পাড়াগাঁয়ের মেয়ে—বারো বছরে যজ্ঞি-বাড়ি সামলে দিতে পারে। ওর রান্নার হাতটিও ভারি মিষ্টি।"

সুধা বেরিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। উঠোনে পড়ে থাকা অশোকের সুটকেসটা তুলে আনল দাওয়ায়। বললে, "রান্নাঘরে আলু তো ফুরিয়ে গেছে জেঠাইমা।"

"ছুটো নিয়ে যা ভাঁড়ার থেকে।"

সুধা ভাঁড়ারে চলে গেল। আলু নিয়ে বেরিয়ে এসে আবার নিঃশব্দে ঢুকল রান্নাঘরে। একটু পরেই কাঠের ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে লাগল কুণ্ডলী পাকিয়ে।

আনমনা ভাবে অশোক বললে, "শশীঠাকুরের এখন কেমন চলছে মা ?"

মা একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন : "কেমন আর চলবে ? মরতে মরতে বেঁচে রয়েছে। শুধু এই মেয়েটার যদি ভালো ঘর-সংসারে একটা বিয়ে-থা দিতে পারত—"

মা থামলেন। অশোক সংক্ষেপে বললে, "হুঁ।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। নিমের ছায়ার ঝিলমিলি জ্যোৎস্না। রান্নাঘরে কাঠ পোড়বার আওয়াজ। দরজার ফাঁকে একবারের জন্যে সুধার অরক্তিম আভা-মাখানো ছায়া দেখতে পাওয়া গেল।

মা বললেন, "আর কতক্ষণ বারান্দায় বসে থাকবি ? ঘরে আয়, জামা-কাপড় ছেড়ে নে।'

অশোক বললে, "থাক্ মা, এখানেই বসি। বেশ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে। তুমি বরং আমার পাঞ্জাবিটা ঘরে নিয়ে যাও।"

মা ঘরে গেলেন। অশোক রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে বসে রইল।

মার গলা শোনা গেল, "তুই একটু বোস্ তবে। আহ্নিকটা সেরে নিই আমি।"

"বেশ তো, নাও না।

অশোক বসেই রইল। ঝিঁঝিঁ ডাকছিল সমানে। এবারে একটা পাপিয়া ডেকে উঠল ওদিকের সিসুগাছের ডাল থেকে। হাওয়ায় পোড়া কাঠের গন্ধ। রান্নাঘরে হাঁড়ি-খুন্তির আওয়াজ। সুধা খিচুড়ি চাপাচ্ছে।

স্মৃতি। এই বাড়ি—এই বারান্দা—ওই ঘর। সাত-আটটা বছর নয়—যুগ-যুগান্তর। মার চুল অর্ধেক শাদা হয়ে গেছে। উঠোনের ওই কোণটাতে জলচৌকি টেনে নিয়ে বসে তামাক খেতেন বাবা। ভোরবেলা একটা করে দাঁতন ভেঙে নিতেন নিমগাছটা থেকে। ছেঁড়া ফ্রকের কোঁচড়ে একরাশ লাল লাল করমচা আর বাঁ হাতে একটুখানি নুন নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়াত ছোট্ট মেয়ে সুধা।

বুকের ভিতরে টনটনিয়ে উঠল অশোকের, চোখে জল আসতে চাইল—কী যেন একটা আটকে এল গলার কাছে। না, আর পালানো চলে না। এবার মার কাছে থাকবে। মার কাছেই আর—

কী যে খেয়াল হল, হঠাৎ বারান্দা থেকে নেমে সোজা রান্নাঘরে।

হাঁড়িতে চাল-ডাল নিয়ে নাড়ছিল সুধা। চমকে ফিরে তাকাল।

আগুনের আভা মাখা ব্রোঞ্জের পুতুলের মত সুধার শ্যামশ্রী

মুখের দিকে তাকিয়ে অশোক বললে, "তোমার রান্না দেখতে এলাম।"

সুধা একখানা পিঁড়ি এগিয়ে দিলে : "বসুন।"

অশোক চেপে বসল ভালো করে।

"বেশি লঙ্কা দিয়ো না কিন্তু। পাঁচ বছর ঘুরেছি বাংলা দেশের বাইরে। লঙ্কা খাওয়ার অভ্যেস ছেড়ে গেছে একেবারে।"

সুধা হাসল : "আচ্ছা।"

মেয়েটার দাঁতগুলো ভারি সুন্দর—হাসিটাও।

হাঁড়িতে জল ঢেলে সুধা তার উপর ঢাকনা চাপিয়ে দিলে। অশোক হাঁ-হাঁ করে উঠল, "আরে আরে, ও কী করলে ?"

সুধা আশ্চর্য হল : "কেন—কী হয়েছে ?"

"ওইটুকু জল দিলে ? ওতে সেদ্ধ হবে ?"

"হবে বইকি।"

"কক্ষনো না। আমি নিজের হাতে কতদিন খিচুড়ি রান্না করেছি, তা জানো ? একমুঠো চাল-ডাল দিয়ে তাতে এক হাঁড়ি জল ঢেলে দিতাম। তারপর—"

"তারপর সেটা আর খিচুড়ি হত না—ডাল হয়ে যেত। কী বলেন ?" সুধা হাসল।

হা-হা করে হেসে উঠল অশোক : "তা মন্দ বল নি। ডালও হত বইকি কখনো কখনো। তাতে বেশ করে একটুখানি নুন-তেল ঢেলে নিতাম, তারপরে বাটিতে ঢেলে চুমুক দিয়েই শেষ করে দিতাম।"

অশোক আবার অট্টহাসি হেসে উঠল। সুধার শান্ত হাসির জল-তরঙ্গ বেজে উঠল তার সঙ্গে।

আর ঘরে বসে আহ্নিক করতে করতে হঠাৎ ধ্যানভঙ্গ হয়ে গেল মার। জপের মালায় থমকে গেল আঙুল। কী একটা ভাবছিলেন

ঠিক ধরতে পারছিলেন —আচমকা সেটা যেন স্পষ্ট হয়ে গেল তাঁর কাছে একবারের জন্যে মার মুখ ঝলমল করে উঠল।

বাইরে একটানা ডেকে চলল পাপিয়াটা।

খাওয়া-দাওয়ার পাট মিটিয়ে চলে গেছে সুধা। বলে গেছে কাল সকালে এসে অশোকদার চা তৈরি করে দিয়ে যাবে।

অশোক শুয়ে পড়েছিল, মা এসে বসলেন শিয়রের কাছে। বালিশ থেকে অশোকের মাথাটা সরে এসে মার কোলের উপর পড়ল। ছেলের কপালে হাত রাখলেন মা।

"হ্যাঁ রে পাগলা, আবার পালিয়ে যাবি না তো ?"

"না মা, না।"—ছু হাত দিয়ে অশোক মার কোমর জড়িয়ে ধরল : "তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাব না।"

"ভালো হয়ে থাকবি ?"

"একেবারে ভালো ছেলে। জায়গা-জমি দেখব, তোমাকে দেখব, আর গাঁয়ের স্কুলে যদি একটা মাস্টারি পাই তা-ও করব।" অশোকের স্বর একটুখানি আবছা শোনাল। ওর ঘুম আসছিল।

মার চোখে জলে ঝাপসা হয়ে এল। আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে এবার ছেলের গলায় হাত রাখলেন। ঈশ্, কী রোগা হয়ে গেছে, খাঁড়ার মত উঠে পড়েছে কণ্ঠার হাড়!

মা বললেন, "গলা খালি দেখছি যে! পৈতে নেই বুঝি ?"

অশোক বললে, "সে কবে হারিয়ে গেছে!"

"কাল একটা পরবি কিন্তু।"

"নিশ্চয় পরব। তোমার পৈতের ভাণ্ডারে নিশ্চয়ই ছুটো-চারটে আছে।"

ছুটো-চারটে! বিয়ের সময় পাওয়া হাতবাক্সটা প্রায় ভরে

উঠেছে রাশি রাশি পৈতেয়। কেউ নেয় না—নেবার লোক নেই। আবার জল আসতে চাইল মার চোখে।

অশোক প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। মা ডাকলেন, "অশোক!"

"বলো।"

"এবার তোর বিয়ে দেব।"

অশোক অল্প একটু হাসল। জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, "আচ্ছা।"

একবারের জন্যে দ্বিধা করলেন। একবারের জন্যে সংকুচিত হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, "ওই মেয়েটাকে—ওই শশী ঠাকুরপোর মেয়ে সুধাকে বউ করে আনলে কেমন হয়?"

অশোকের তন্দ্রায় ধাক্কা লাগল একটা।

"সুধা!"

"ও বড় ভালো মেয়ে বাবা।"—মার গলায় সভয় মিনতি।

অশোক হাসলঃ "বুঝেছি। সেইজন্যে বুঝি আগে থেকেই ওকে তালিম দেওয়া হচ্ছে! তা ব্যস্ত কিসের? সুধাও পালাচ্ছে না—আমিও না।"

ডান হাতে মার কোমরটা আবার জড়িয়ে ধরে অশোক সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল এবারে।

কিন্তু শেষরাতেই মা-ছেলেকে জেগে উঠতে হল। বাইরে থেকে হাঁক উঠছেঃ "অশোকবাবু—অশোকবাবু—"

"কে অন্ধকার থাকতেই আমায় আপ্যায়ন করতে এল?"—বিরক্ত হয়ে উঠে অশোক দরজা খুলল।

চতুর্দশীর চাঁদ ডুবে গেছে। অন্ধকারে ছাওয়া উঠোন। টর্চের আলো জ্বলছে। পুলিস।

কাগজের মত শাদা হয়ে গেল মার মুখ। মাটিতে পড়ে যাওয়ার আগে চৌকাঠ চেপে ধরলেন।

অশোক বললে, "কী চান ? সার্চ করবেন ?"

দারোগা বললেন, "সার্চ দরকার নেই। আপনাকে হলেই চলবে।"

অশোক একটা মৃদু নিশ্বাস ফেলল : "সাত বছর আগেকার জের এখনো মেটে নি ? আমি তো সব ছেড়ে দিয়েছি।"

দারোগা লজ্জিত হয়ে বললেন, "আমরা হুকুমের চাকর। এই দেখুন ওয়ারেন্ট।"

অশোক বললে, "দেখবার দরকার নেই। চলুন। মা, জামাটা এনে দাও ঘর থেকে।"

মা পারলেন। ঘর থেকে নিয়ে এলেন জামাটা। বুক-ফাটা চিৎকার করলেন না—আছড়ে পড়ে গেলেন না মাটিতে। মা এখনো পারেন। এ-বাড়িতে পঞ্চাশ বছর ধরে তিলে তিলে এই সংযম আর আত্মনিগ্রহের শিক্ষাই তো পেয়েছেন।

প্রণাম করে বিদায় নিল অশোক।

মা দাঁড়িয়ে রইলেন। অন্ধকার ফিকে হয়ে গেল, আকাশ শাদা হল, সূর্য উঠল। মা দাঁড়িয়ে রইলেন। এখুনি সুধা আসবে অশোককে চা করে দিতে।

দূরের নদী থেকে আবার ভাটিয়ালী গান শোনা গেল। সেই অশরীরী কণ্ঠের সেই গান। সেই পুরনো সুর—আকাশ-নদী-নক্ষত্র-সূর্যের সেই একতান কান্না !

আবার তকলি নিয়ে বসতে হবে। আবার পৈতে কাটার পালা। রাশি রাশি পৈতে জমে উঠবে ঘরে। কে নেবে ? কাকে দেবেন ?

মা জানেন না।